# যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার
## (কিশোর-কিশোরিদের জন্য তথ্যসংকলন)

# Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR)
## (A Handbook for the Adolescents)

Share-Net International

TURNING POINT

# যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার
## (কিশোর-কিশোরিদের জন্য তথ্যসংকলন)

# Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR)
## (A Handbook for the Adolescents)

সংস্করণ ১.০
(Version 1.0)

সহযোগিতায়
(Supported by)

Share-Net International

শেয়ার-নেট ইন্টারন্যাশনাল
www.share-netinternational.org

প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে
(Planned and implemented by)

TURNING POINT

টার্নিং পয়েন্ট ফাউন্ডেশন

১৭/বি মনিপুরীপাড়া (২য় তলা), সংসদ অ্যাভিনিউ, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ
মোবাইল: +৮৮ ০১৭৮৬১০০৯০০, ফোন: +৮৮ ০২ ৯১৪৫১৫১, ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৯১৪৫০৫৫
ইমেইল: info@turningpointbd.org; turningpointbd@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.turningpointbd.org

# TURNING POINT

*বৈচিত্র্য, ন্যায্যতা ও সকলের অংশগ্রহণ, তবেই সম্ভব টেকসই উন্নয়ন*

***Striving for Diversity, Equity & Inclusion for Sustainable Development***


প্রকাশনায় : টার্নিং পয়েন্ট ফাউন্ডেশন
১৭/বি মনিপুরীপাড়া (২য় তলা), সংসদ অ্যাভিনিউ
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ
মোবাইল: +৮৮ ০১৭৮৬১০০৯০০
ফোন: +৮৮ ০২ ৯১৪৫১৫১, ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৯১৪৫০৫৫
ইমেইল: info@turningpointbd.org; turningpointbd@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.turningpointbd.org

প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর, ২০১৭



রচনা ও সংকলন : অলিভিয়া রড্রিক্স
আবু হানিফ মোহাম্মদ ফরহাদ
শিখা খাতুন
আব্দুল গাফ্‌ফার
প্রতীক জন রোজারিও

সম্পাদনা : জীবন উইলিয়াম গমেজ



বর্ণবিন্যাস ও অলংকরণ : টার্নিংপয়েন্ট ক্যাপাসিটি বিল্ডিং টিম

টার্নিং পয়েন্ট ফাউন্ডেশন-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তত্ত্বাবধান
অমিত রিচার্ড রোজারিও
পল তির্কী
আমিনুল ইসলাম


*'জ্ঞান বিনিময় হোক উন্মুক্ত, বিকাশ হোক বাধাহীন'*

***'Knoweldge sharing be open and development without barriers'***

- আমাদের তথ্য সংকলন এই প্রচারণারই অংশ
- Our handout is the part of the Campagin

এটি ডাউনলোড করা যাবে নিচের ওয়েবসাইট থেকে **(You can download it from the following website)**

**www.turningpointbd.org**

# সূচিপত্র


**প্রথম অধ্যায়**

কিশোর-কিশোরিদের কথা ........ ১

**দ্বিতীয় অধ্যায়**

সেক্স ও জেন্ডার ........ ৯

**তৃতীয় অধ্যায়**

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার ........ ১১

**চতুর্থ অধ্যায়**

যৌন হয়রানি ........ ১৫

**পঞ্চম অধ্যায়**

প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা ........ ২১

**ষষ্ঠ অধ্যায়**

প্রতিবন্ধী নারীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার ........ ৩১

সহায়ক তথ্যপঞ্জি ........ ৩৪

# প্রথম অধ্যায় (Chapter One)
## কিশোর-কিশোরিদের কথা
(About the Adolescents)

**বয়ঃসন্ধিকাল ও কৈশোর**

বয়ঃসন্ধি কালকে ইংরেজীতে বলা হয় (Puberty)। এর একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া আছে যার মাধ্যমে একটি শিশুর শরীর একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শরীরে রুপান্তরিত হয় এবং প্রজননের সক্ষমতা লাভ করে। বয়ঃসন্ধির মধ্যভাগে এই বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় এবং বয়ঃসন্ধি শেষ হবার মাধ্যমে এই বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হয়। বয়ঃসন্ধি শুরুর পূর্বে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রায় সম্পূর্ণটাই বলতে গেলে শুধু যৌনাঙ্গের ভেতর সীমাবদ্ধ থাকে। বয়ঃসন্ধির সময় শরীর গঠনের আকার-আকৃতি,গুরুত্ব ও কাজে প্রধান পার্থক্যগুলো প্রতীয়মান হয়। এদের মধ্যে পরিবর্তনগুলোকে সেকেন্ডারি যৌন বৈশিষ্ট বলা হয়। আক্ষরিক অর্থে বয়ঃসন্ধি বলতে বুঝায় যৌন পরিপক্বতার জন্য মানুষের শরীরে যে পরিবর্তন আসে তাকে। বয়ঃসন্ধিকালের উন্নতিতে মনোসামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভুমিকা এটার অন্তর্ভূক্ত নয়। বয়ঃসন্ধিকাল হচ্ছে শৈশব ও সাবালকত্বের মধ্যবর্তী একটি সামাজিক ও মানসিক ক্রান্তিকাল। এ সময় মস্তিষ্ক থেকে ডিম্বাশয় ও শুক্রাশয় (Gonad or Sex Cell) হরমোনে সংকেত যাবার মাধ্যমে এটির সূচনা ঘটে। পুরুষ স্তনে পেশীর বৃদ্ধি, পিট, কোমর, নিতম্ব ও উরুতে পেশি বৃদ্ধি, শরীর ও মুখের লোম, শুক্রাশয়ের আকার, কাজ এবং উর্বরতা ফলে ডিম্বাশয় ও শুক্রাশয় (গোনাড) বিভিন্ন ধরনের হরমোন উৎপাদন শুরু করে যার ফলে মস্তিষ্ক, অস্থি, পেশি, ত্বক, স্তন এবং জনন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের বৃদ্ধি শুরু হয়। বয়ঃসন্ধির মধ্যভাগে এই বৃদ্ধি শুরু হয় এবং বয়ঃসন্ধি শেষ হবার মাধ্যমে এই বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হয়। বয়ঃসন্ধিকাল, বয়ঃসন্ধির সময় দ্বারা প্রভাবিত হয় বটে কিন্তু এটার আলোচনার সীমারেখা যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। সাধারণত বয়ঃসন্ধিকালের ব্যাপারে আলোচনার ক্ষেত্রে কৈশোর সময়কার শারীরিক পরিবর্তনের চেয়ে মনোসামাজিক ও সাংস্কৃতিক এবং আচার-আচরণের বিকাশকেই বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়।

**কিশোর-কিশোরীদের যে সব বিষয়ে জ্ঞান ও ধারণা থাকা প্রয়োজন সেগুলো হল:**

- মূল্যবোধ
- বাল্যবিবাহ এবং এর কুফল
- কিশোর-কিশোরীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বিশেষ করে মেয়েদের প্রথম মাসিক সম্পর্কে জানা।
- কিশোর-কিশোরী ও যুবকদের বিষয়ে আগে ও পরে যৌন আচরণ, জন্ম রহস্য ও পরিবার পরিকল্পনা।
- অপ্রতিরোধ্য অনাকঙ্খিত যৌন আচরণের কারণে বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে ধারণা
- কম বয়সে গর্ভধারণ অনাকঙ্খিত গর্ভধারণ এবং নিরাপদ এম,আর ও নিরাপদ যৌন কর্ম
- মাদকাশক্তি ও ধুমপানের কুফল
- বিয়েতে যৌতুক গ্রহণের কুফল
- অপুষ্টি, বিশেষভাবে আচরণ, ভিটামিন ও আয়োডিনের ঘাটতি।
- প্রতিরোধহীন এবং অনাকঙ্খিত যৌন আচারণের কারণে অনিরাপদ গর্ভপাতের জটিলতা
- মেয়েদের উপর শারিরীক ও মানসিক নির্যাতনের কুফল
- যৌন হয়রানি ও ধর্ষণ

কিশোর-কিশোরী এবং তাদের অভিভাবকদের গর্ভধারণ, প্রসবকালীন (ডেলিভারি) এবং বিভিন্ন পর্যায়ে রোগ প্রতিরোধ, জরুরি প্রসূতি সেবা, গর্ভকালীন পরিচর্যা, গর্ভবতী পরিচর্যা ও অন্যান্য ধারণা।

**বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তন:** ছেলে ও মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ সময়ে শারীরিক পরিবর্তন হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয়। এতে লজ্জা বা ভয় পাবার কিছু নেই।

**ছেলেদের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তন:**

- কন্ঠস্বর ভারী হয়
- দাঁড়ি-গোঁফ গজায়
- শরীরে লোম

- শ্রোণীদেশে লোম
- স্তনের মাংসপেশি বৃদ্ধি

**বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের পরিবর্তন:**

- দ্রুত উচ্চতা ও ওজন বাড়ে
- চামড়া তেলতেলে হয়
- সব স্থায়ী দাঁত উঠতে থাকে
- বগলের নিচে চুল গজায়
- যোনী অঞ্চলে চুল গজায়
- ঘাম বেশি হতে শুরু করে
- গলার স্বর ভারি হয়
- স্তন বড় হয়
- কোমর সরু হয়ে আসে এবং নিতম্বের আকার বড় হয়
- যৌনাঙ্গ,জরায়ু এবং ডিম্বকোষ বড় হয়
- মাসিক শুরু হয়
- স্বপ্নদোষ হয় যদিও সেটা ছেলেদের মত নয়

**বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক পরিবর্তন**

বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক পরিবর্তনগুলো হলো-

১. ছেলেমেয়েরা নিজেদের প্রাপ্তবয়স্ক ভাবতে শুরু করে এবং অন্যদের কাছ থেকে সে অনুযায়ী আচরন আশা করে
২. স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে চায়
৩. বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গ ভালবাসে ও তাদের উপর নির্ভর করে
৪. আর্থিকভাবে স্ব-নির্ভর হতে চায়
৫. আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি পায় ও আত্মকেন্দ্রিক হয়
৬. নিজেকে আকর্ষনীয় করে তুলতে চায়
৭. নিজের সম্পর্কে অন্যেদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে ভাবনা শুরু হয়
৮. কৌতুহল বাড়ে ও যৌনতা সম্পর্কে আগ্রহ বাড়ে
৯. লজ্জা ভাব বেড়ে যায়
১০. মানসিকভাবে অস্থির থাকে এবং যে কোন ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকে

## প্রচলিত ভুল ধারণা বনাম সঠিক তথ্য

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীরা যে সব প্রচলিত ভুল ধারণা পোষণ করে, তা থেকে মুক্তির জন্য সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। নিচের ছক থেকে কিছু প্রচলিত ধারণার পাশাপাশি সঠিক তথ্য কিশোর-কিশোরীরা পেতে পারে।

| প্রচলিত ভুল ধারণা | সঠিক তথ্য |
|---|---|
| মাসিক এক ধরনের রোগ | মাসিক কিশোরীদের একটি স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়া। এটি সব কিশোরীরই হয়। |
| স্বপ্নদোষ বা বীর্যপাত খারাপ ছেলেদের হয়। এতে শরীরের শক্তি ক্ষয় হয়। | স্বপ্নদোষ কিশোরদের একটি স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়া। এটি সব কিশোরেরই হয়। এতে কোন ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয় না। |
| বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন এক ধরনের শারীরিক সমস্যা। | বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন দিয়ে দুঃচিন্তাগ্রস্থ হওয়ার কোন কারণ নেই। একজন মানুষ যখন কৈশর থেকে |

| প্রচলিত ভুল ধারণা | সঠিক তথ্য |
|---|---|
| | যৌবনে উত্তীর্ণ হয় তখন তার শারীরিক ও মানসিক কিছু পরিবর্তন হবেই। |
| খারাপ ছেলে-মেয়েদেরই শারীরিক পরিবর্তন ঘটে। | সুস্থ স্বাভাবিক ছেলে-মেয়েদেরই শারীরিক পরিবর্তন ঘটে। |
| মাসিকের সাথে দেহের দূষিত রক্ত বের হয়ে আসে। মাসিক হওয়ার লজ্জার। | মাসিক কোনো অসুখ নয়। মাসিকের রক্ত দূষিত নয়। বরং শরীরের তাজা রক্তই বাইরে বের হয়ে আসে। রক্ত জমাট বাঁধলে কিছুটা কালচে দেখায়। তাই মাসিকের রক্ত কিছুটা কালো। |
| যৌনরোগ সম্পর্কে কাউকে জানানো লজ্জার ব্যাপার। | যৌনরোগ একটি শারীরিক অসুস্থতা যার ফলাফল অন্যরোগের তুলনায় মারাত্মক। যৌনরোগের কোন লক্ষণ যেমন-পুরুষ বা স্ত্রী অঙ্গে ঘা বা চুলকানি হওয়া, প্রসাবের রাস্তা দিয়ে পুঁজ বের হওয়া, অন্ডকোষ ফুলে যাওয়া ইত্যাদি দেখা দিলে দ্রুত ডাক্তার দেখানো উচিত। |
| বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনে অনেকে উত্যক্ত করে, লজ্জা দেয় এবং ভয় দেখায়। | বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন নিয়ে কাউকে উত্যক্ত করা কিংবা লজ্জা দেয়া ঠিক নয়। বরং তাকে মানসিকভাবে সাহায্য করা উচিত। |
| বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলি লজ্জার, তাই কারো সাথে এ সম্পর্কে আলোচনা করা ঠিক নয়। | বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন স্বাভাবিক। অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত কারো কাছ থেকে যেমন-বাবা-মা, বড় ভাই-বোন বা শিক্ষকদের পরামর্শ মেনে চললে শারীরিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। |
| এইডস্ একটি ভয়ংকর রোগ। এর থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই। | এইডস্ এর কোনো প্রতিষেধক নেই। তাই প্রতিরোধই এইডস্ থেকে দূরে থাকার একমাত্র উপায়। |
| এইডস্ রোগীকে সমাজের বাইরে বের করে দেয়া দরকার। | এইডস্ রোগী সমাজের সকলের ভালবাসা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা নিয়ে অনেকদিন ভালোভাবে বেচেঁ থাকতে পারে। |
| খারাপ ছেলে - মেয়েদেরই যৌনচিন্তা হয়। | কিশোর-কিশোরীদের মনে যৌনচিন্তা আসে, এটা দোষের কিছু নয়। তবে এ সময় লেখাপড়া, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখলে এসব দুশ্চিন্তা মাথায় আসে না। |
| বাজে ছেলে- মেয়েরাই বেশি হাসি তামাশা করে। | হাসি খুশি-আনন্দে থাকা শারীরিক ও মানসিক সুস্থতাকে সহায়তা করে অনেক বেশী। |
| মেয়েদেরকে কম বয়সেই বিয়ে দেয়া দরকার। এতে ঝামেলা কমে। | বাল্যবিবাহ মা ও শিশু উভয়ের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ সাধারণত ১৮ বছরের আগে মেয়েদের শরীর সন্তান ধারণ ও প্রসবের উপযুক্ত হয় না। |
| যৌন হয়রানি করা বা কাউকে যৌনতা বিষয়ে উত্যক্ত করে মজা বেশি। | যৌন হয়রানি বা নির্যাতন একটি সামাজিক ব্যাধি। এর থেকে রেহাই পেতে সবাইকে সচেতন হতে হবে এবং প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। |
| মাসিকের রক্ত, রক্ত ভেজা কাপ, প্যাড লুকিয়ে রাখা উচিত। কারণ মাসিক হওয়া খারাপ। | মাসিকের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা অতীব জরুরী। |
| যৌন কাজ করে ধুয়ে ফেললে এইচআইভি'র জীবানু দেহ থেকে চলে যায়। | এইডস্ আক্রান্ত পুরুষ বা মহিলার সাথে অনিরাপদ যৌন কাজ করলে যৌন রসের মাধ্যমে এইডস্ এর জীবানু ছড়াতে পারে। |

| প্রচলিত ভুল ধারণা | সঠিক তথ্য |
|---|---|
| একজনের ব্যবহৃত সুঁই দিয়ে অন্যজন ইনজেকশন নিলে এইডস্ হবার সম্ভাবনা নেই। | এইডস্ আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত সুঁই দিয়ে বিভিন্ন জন ইনজেকশন নিলে এইডস্ বা এইচআইভি একজনের দেহ থেকে অন্যজনের দেহে প্রবেশ করতে পারে। |
| যারা বাজে জায়গায় যায় তাদের দেহেই শুধুমত্র এইচআইভি জীবানু থাকে। | এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে এইডস্ এর জীবানু থাকে। এইডস্ আক্রান্ত লোকের রক্ত শরীরে নিলে রক্তের মাধ্যমে এইডস্ এর জীবানু ছড়াতে পারে। |
| এইচআইভি আক্রান্ত মায়ের দুধ সন্তান পান করলে এইডস্ হয় না। | এইডস্ আক্রান্ত মায়ের সন্তান হলে বা এইডস্ আক্রান্ত মায়ের দুধ সন্তান পান করলে শিশুর দেহেও এইচআইভি জীবানু সংক্রামিত হতে পারে। |
| এইচআইভি জীবানু দেহে প্রবেশ করার সাথে সাথেই সে এইডস্ রোগী হয়। | এইডস্ এর জীবানু থেকে রোগ লক্ষণ প্রকাশ পেতে কারো কারো বেলায় ৩/৪ বছর আবার কারো কারো বেলায় ১০/১৫ বছরও লাগতে পারে। |
| যৌনরোগের জন্য ফুটপাতের হকারদের ঔষুধ অনেক কার্যকরী। | যে কোন রোগ বা যৌনরোগের চিকিৎসার জন্য ফুটপাত থেকে ক্যানভাসারদের ঔষুধ ব্যবহার করা ঠিক নয়। কারণ ক্যানভাসারদের কথার বেশীর ভাগই সাজানো, অতি রঞ্জিত ও ভুল তথ্যে ভরপুর। |
| হস্তমৈথুন করলে যৌনরোগ হয়, লিঙ্গ সরু ও বাঁকা হয়ে যায়, যৌন দুর্বলতা দেখা দেয়। | হস্তমৈথুন করলে যৌনরোগ হয় না, অতিরিক্ত হস্তমৈথুন এর ফলে শারীরিক দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। |
| খারাপ ছেলেরা হস্তমৈথুন করে। | সবাই হস্তমৈথুন করে। এটা ভাল- খারাপের বিষয় নয়। |

**প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনীয়তা**

**কিশোরদের স্বপ্নদোষঃ** একটি ছেলে যখন ১২-১৩ বছর বয়সে পৌঁছায়, তখন তার বীর্য (ধাতু) তৈরী হতে শুরু করে। বীর্য যখন ঘুমের মধ্যে বেরিয়ে আসে তখন তাকে স্বপ্নদোষ বলে। এটি কোন রোগ বা দোষ নয় তাই এর কোন চিকিৎসার দরকার নেই। কোনো কোনো সময় যৌনবিষয়ক চিন্তা বা স্বপ্নের সাথে স্বপ্নদোষ হওয়ার সম্পর্ক থাকে। স্বপ্নদোষ হলে কি করতে হবে? স্বপ্নদোষ হলে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। শরীর থেকে বীর্য মুছে কাপড় বদলে ফেলতে হবে। সম্ভব হলে গোসল করে পরিষ্কার কাপড় পরে নিতে হবে।

- এটি একজন কিশোরের প্রজননতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশের পরিচায়ক।
- কিশোরদের স্বপ্নদোষ হলে অবশ্যই সেই কাপড় ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হবে।
- অপরিষ্কার প্যান্ট, লুঙ্গি বা কাপড় পরার কারণে নানা ধরনের চুলকানি ও সংক্রমণ হতে পারে।
- বয়ঃসন্ধিকালে স্বপদোষ একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। স্বপ্নদোষ শারীরিক কোনো অসুবিধা করে না, শরীরকে দুর্বলও করে না। সুতরাং এটি নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।
- প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে হবে। তাহলেই সুস্থ জীবন গড়ে উঠবে। ভুলপথে যাওয়ার ঝুঁকি থাকবেনা।

**কিশোরিঃ** বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীরা প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে,তাই এই সময় থেকেই প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে জানার কোনো দরকার নেই। এ ধারণা সঠিক নয়, কারণ প্রজনন সক্ষম হবার সাথে সাথেই প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পকে সঠিকভাবে জানতে পারলে কিশোর-কিশোরীরা সঠিকভাবে নিজেদের যত্ন নিতে পারবে। তারা এ শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে সুস্থ- সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারবে ও ভুল পথে পরিচালিত হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে।

**ঋতুস্রাব বা মাসিককালীন করণীয়**

- মেয়েদের ৯-১৩ বছর বয়সে যে কোনো সময় মাসিক শুরু হয় এবং ৪৫-৪৯ বছর বয়স পর্যন্ত তা থাকে।
- মাসিক মেয়েদের একটি স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়া। স্বাভাবিক নিয়মে প্রতি মাসিকের মাঝামাঝি সময়ে একটি করে ডিম্বাণু পরিপক্ক হয়। পরিপক্ক ডিম্বাণুটি নিষিক্ত না হলে মাসিকের রক্তের সাথে বেরিয়ে আসে।
- এটি একজন কিশোরীর প্রজননতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশের পরিচায়ক।
- জীবনের প্রথম মাসিক হবার আগেই পরিপক্ক ডিম্বাণু যদি শুক্রাণুর সাথে মিলিত হয়, তবে গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং প্রথম মাসিক হবার আগে যৌনমিলন হলেও পেটে বাচ্চা আসতে পারে। তাই কিশোরীদের সঠিক তথ্য জানতে হবে এবং সেভাবে নিজেকে অনাকাঙ্খিত ঘটনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে।
- মাসিকের সময় পরিষ্কার কাপড়/স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার করতে হবে। যদি কাপড় ব্যবহার করা হয় তবে তা পুনরায় ব্যবহারের আগে অবশ্যই সাবান দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে কড়া রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। একটি প্যাড মাত্র একবারই ব্যবহার করা স্বাস্থ্যসম্মত।
- অপরিচ্ছন্ন নোংরা কাপড়/স্যানিটারি প্যাড ব্যবহারের কারণে প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ হতে পারে, যা শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।
- মাসিকের রক্ত যেন কাপড়ে লেগে না যায় সেজন্য স্যানিটারী ন্যাপকিন ব্যবহার করতে হবে যদি সেগুলো কেনা সম্ভব না হয় তবে পরিষ্কার পাতলা কাপড় ভাঁজ করে ব্যবহার করা যায়।
- ঋতুস্রাব বা রক্তস্রাবের পরিমাণ অনুযায়ী স্যানিটারী ন্যাপকিন বা কাপড় দিনে অন্ততঃপক্ষে ৩ ঘন্টা পর পর বদলাতে হবে এবং ভালোভাবে ধুয়ে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে।
- কাপড় ব্যবহার করলে সেই কাপড় সাবান বা সোডা দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে রোদে শুকাতে হবে। পরবর্তী ব্যবহারের জন্য পরিষ্কার জায়গায় রাখতে হবে যাতে কোন ধুলাবালি কাপড়ে লেগে না যায়।
- এ সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে এবং নিয়মিত সাবান পানি দিয়ে গোসল করতে হবে।
- পুষ্টিকর ও সুষমখাদ্য বা প্রতিদিন যেসব খাবার খায় তা নিয়মিত খেতে হবে, বেশি বেশি পানি পান করতে হবে এবং হাসি-খুশি থাকা।
- মাসিককালীন সময়ে তলপেটে অল্পমাত্রায় ব্যথা প্রায় সবারই হয় এতে ভয়ের কিছু নেই।
- তবে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিবেশ, পুষ্টিহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা আর জীবনযাপন পদ্ধতির পরিবর্তনও ব্যথার মাত্রাকে বাড়িয়ে দিতে পারে।

এসময় নিজেকে অশুচি ভাবার কোন কারণ নেই। এ সময় প্রতিদিনের নিয়মিত কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবে করা যায়। যেমন- স্কুলে যাওয়া, গৃহস্থলীর কাজকর্ম ইত্যাদি। কুসংস্কার দূর করে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবছর **২৮ মে বিশ্ব মাসিক পরিচর্যা দিবস** পালন করা হয়ে থাকে।

**ঋতুস্রাব বা মাসিককালীন সময়ে যেসব করা উচিত নয়**

- ব্যবহৃত স্যানিটারি প্যাডটি যেখানে সেখানে বা কমোডে ফেলবেন না
- প্যাডের বদলে কাপড় বা তুলো ব্যবহার করবেন না
- স্যানিটারি প্যাডটি যেখানে ফেলবে; প্রথমে প্যাডটিকে প্যান্টি থেকে আলাদা করে পানি দিয়ে ধুয়ে কাগজ বা পলিথিনে মুড়িয়ে ময়লা ফেলার নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলতে হবে এবং ঝুড়ির ঢাকনা ভালো করে বন্ধ করতে হবে।
- মাসিককালীন সময়ে অস্বাস্থ্যকর কাপড়, তুলা, টিস্যু ব্যবহারের কারণে আমাদের দেশে শতকরা প্রায় ৯৭% ভাগ নারীর সার্ভিক্যাল ইনফেকশন হয়।

**অস্বাভাবিক ঋতুস্রাব (মাসিক) কি**

নিচের যেকোন একটি বা একাধিক লক্ষণ দেখা দিলে তাকে অস্বাভাবিক ঋতুস্রাব বা মাসিক বলে। নিচে সেগুলো দেওয়া হল-

- অতিরিক্ত রক্তস্রাব হওয়া প্রতি ৩০মি: পর পর ন্যাপকিন বদলের প্রয়োজন হলে।

- একই মাসে একাধিক বার ঋতুস্রাব হলে।
- দিনের বেশী সময় ধরে ঋতস্রাব হলে।
- ঋতুস্রাবের মধ্যবর্তী সময়ে ফোটা ফোটা রক্তস্র্রাব হলে।
- কালো চাকা বা জমাট বাধা রক্তস্রাব হলে।
- ঋতুস্রাবের সময় তলপেটে প্রচন্ড ব্যথা হলে।

বয়ঃসন্ধিকালে মাসিক একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। সুতরাং এটি নিয়ে ভয় ও সংকোচের কোনো কারণ নেই।

**৪.৪ প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনরোগ**

জরায়ুর-মুখ ক্যান্সার (সার্জিক্যাল ক্যান্সার) কাকে বলে?

জরায়ুর-মুখ ক্যান্সার মূলত হিউম্যান পেপিলোমা (Human Papilloma Virus-HPV) নামক ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিক এক ধারনের ক্যান্সার। এটি জরায়ুতে বা জরায়ুর প্রবেশদ্বারে হয়ে থাকে এর ফলে জরায়ুর মুখের কোষগুলো অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে এবং সময়মত চিকিৎসা না করালে ক্যান্সার হয়।

**প্রজননতন্ত্রের সংক্রমনের লক্ষণ ও উপসর্গ:**

- অতিরিক্ত সাদা স্র্রাব বা দুর্গন্ধযুক্ত সাদা স্রাব হওয়া
- অতিরিক্ত অথবা অনিয়মিত রক্তস্র্রাব
- যৌনাঙ্গের ভিতরে বা বাইরে চুলকানি হওয়া
- মেয়েদের জরায়ুতে বা ডিম্বনালীতে এবং পুরুষের মুত্রথলীতে সংক্রামণ ছড়িয়ে পড়লে তলপেট ব্যথা হয়।

**প্রতিরোধের উপায়:**

- চিকিৎসার জন্য অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে-
- পিরিওডের সময় এমআর গর্ভপাত প্রসবকালীণ বিষয়গুলো স্বাষ্থ্য সম্মত ও জীবানুমুক্ত পদ্ধতি মেনে চলা।

**এইচআইভি ও এইডস**

এইডস বা ইংরেজীতে AIDS এর পুরো অর্থ হলো Acquired Immune Deficiency Syndrom HIV (Human Immune Deficiency Virus) নামক একটা ভাইরাসের কারণে AIDS হয়ে থাকে। এই ভাইরাসের দেহে প্রবেশ করে মানব দেহের যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে তা নষ্ট করে দেয়। ফলে অন্য যে কোন সাধারণ রোগ একবার হলে তা আর সহজে সারতে চায় না। শরীরে নানা রকমের উপসর্গ ও রোগ লক্ষণ দেখা দেয়। এই উপসর্গের সমষ্টিই হলো এইডস। আক্রান্ত ব্যক্তি ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। এই ভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তে, বীর্যে, যৌনাঙ্গের তরল রসে এবং বুকের দুধের মধ্যে থাকতে পারে। কোন ব্যক্তির শরীরে এইচআইভি জীবাণু প্রবেশের সাথে সাথেই তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারায় না। এইডস এর রোগ লক্ষণ প্রকাশ পেতে অথবা পরিপূর্ণ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারাতে অনেকের ক্ষেত্রে প্রায় ৮-১০ বছর সময় লাগতে পারে।

**যেভাবে এইচআইভি/এইডস ছড়ায়**

- এইচআইভি আক্রান্ত পুরুষ বা মহিলার সাথে অনিরাপদ অথাৎ কনডম ছাড়া যৌন কাজ করলে যৌন রসের মাধ্যমে।
- এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহার করা সুঁই, সিরিঞ্জ বা ইনজেকশন সামগ্রী ব্যবহার করলে বা সূঁচের সাহায্যে নেশা করলে।
- এইচআইভি আক্রান্ত লোকের রক্ত শরীরে নিলে।
- এইচআইভি আক্রান্ত মায়ের গর্ভের সন্তান হলে অথবা আক্রান্ত মায়ের দুধ পান করলে ঐ সন্তানের দেহেও এইচআইভি ছড়াতে পারে ।

### যেভাবে এইচআইভি/এইডস ছড়ায় না

উপরের মাধ্যমগুলি ছাড়া অন্য কোনভাবে অর্থাৎ সাধারণ মেলামেশা, চলাফেরা করা, হাত-ধরা, কোলাকুলি করা, চুম্বন, একই সাথে খাওয়া-দাওয়া বা বসবাস, ঘুম, একই কাপড়-চোপড় পরলে, একই থালা-বাসন, পায়খানা, গোসলের পানি, বিছানা ব্যবহার করলে, মশা- মাছির কামড়, আক্রান্ত ব্যক্তি হাঁচি-কাশি বা থুথু ইত্যাদির মাধ্যমে এইডসের জীবাণু ছড়ায় না।

### যেভাবে এইআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়

- ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা।
- স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা।
- এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে যৌন মিলনের সময় অবশ্যই সঠিকভাবে কনডম ব্যবহার করা।
- রক্ত গ্রহণের আগে রক্ত এইআইভিমুক্ত কিনা তা পরীক্ষা করে নেয়া
- অন্যের ব্যবহৃত সূঁচ-সিরিঞ্জ ব্যবহার না করা।
- যৌনাঙ্গে কোন ঘা বা ক্ষত থাকলে স্বামী-স্ত্রী অথবা যৌনসঙ্গীসহ দ্রুত চিকিৎসা নেয়া।
- এইচআইভি এইডস্ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে এমন মহিলাদের সন্তান নেয়ার আগে রক্ত পরীক্ষা, ডাক্তার ও কাউন্সেলর এর পরামর্শ নেয়া।

### এইডস্ আক্রান্ত ব্যক্তির করণীয়

আক্রান্ত ব্যক্তির নিজ থেকেই খেয়াল রাখতে হবে যেন তার কাছ থেকে অন্য কারোর দেহে এই জীবাণু ছড়াতে না পারে। অর্থাৎ কনডম ছাড়া কারোর সাথেই যৌন কাজ করা যাবে না, এমনকি স্ত্রী বা স্বামীর সাথেও না। কাউকে রক্ত দেয়া এবং নিজের ব্যবহার করা সিরিঞ্জ বা সুইঁ অন্য কাউকে ব্যবহার করতে দেয়া ঠিক নয়। আক্রান্ত নারীর গর্ভধারণ করার ইচ্ছা হলে, সঠিক তথ্যে ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। এ পর্যায়ে ডাক্তার বা স্বাস্থ্য কর্মীর সাথে পরামর্শ করা দরকার।

### এইডস্ আক্রান্ত ব্যক্তির প্রতি সমাজের করাণীয়

এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে আমাদের মতই সাধারণভাবে বেঁচে থাকতে পাবে। তাই আক্রান্ত ব্যক্তি যাতে সমাজের অন্য যে কোন সাধারণ ব্যক্তির মতই স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে সে ব্যাপারে সব ধরণের সহযোগিতা করতে হবে। আক্রান্ত ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা ও দরদের সাথে আচরণ করে তার ভয়-ভীতি, রাগ বা মানসিক যন্ত্রনা দূর করা, তাকে দৈনন্দিন কাজ কর্মে সহায়তা করা অর্থাৎ তার প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

### সবার রয়েছে নিজের সম্পর্কে তথ্য জানার অধিকার

বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন সবার হয়। এটা স্বাভাবিক, এতে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। তাই এই সময়ের যাবতীয় তথ্য জানার অধিকার সকল কিশোর-কিশোরীদের রয়েছে। কিন্ত আমাদের এই তথ্যগুলোকে আড়াল করে রাখা হয়। কিশোরীদের জানতে দেয়া হয় না বা জানার সুযোগ থাকে খুবই কম। অন্যদিকে অভিভাবকদের কাছে এই সমস্যার কথা কিশোরীরা জানানোর কোন আগ্রহ দেখায় না। অভিভাবকদের সাথে প্রায় ক্ষেত্রেই এইরকম বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেখা যায় না, যাতে সংকোচ ত্যাগ করে কিশোর-কিশোরীরা সহজ হতে পারে এবং সমস্যার কথা জানাতে পারে। এক্ষেত্রে অভিভাবকদেরই এগিয়ে আসতে হবে। কারণ এই বিষয়টার ভূক্তভোগী তারাই। কাজেই তারা এ বিষয়টি আগে অনুধাবন করতে পারেন।
বয়ঃসন্ধিকাল নিয়ে আমাদের সমাজে কিছু কুসংস্কার চালু রয়েছে, যার বেশীরভাগই বিজ্ঞানসম্মত নয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই পড়ে অথবা স্বাস্থ্য কর্মী বা ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সঠিক তথ্য জানতে হবে এবং তা অনুসরণ করতে হবে। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্য সমাধানের জন্য অভিজ্ঞ ডাক্তার বা স্বাস্থ্য কর্মীর পরামর্শ নিতে হবে। ফেরিওয়ালা, হাতুড়ে ডাক্তার, অনভিজ্ঞ কবিরাজ বা ঝাড়-ফুঁক এর মাধ্যমে ভুল চিকিৎসায় বা পরামর্শে রোগ আরো জটিল আকার ধারণ করতে পারে। মনে রাখা দরকার, অসংযত যৌন আচরণ

ব্যক্তি,সমাজ, পরিবারে নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। সমস্যাগুলো হতে পারে শারীরিক, মানসিক বা সামাজিক।

আমাদের প্রচলিত শিক্ষাক্রমের পাঠ্যপুস্তকে বয়ঃসন্ধিকাল বা প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে খুব বেশী তথ্য সংযোজন করা হয় না। যা-ও বা একটু আছে তা-ও ক্লাসে সঠিক ভাবে পড়ানো হয় না। অনেক ক্ষেত্রে এই অংশটাকে উপেক্ষা করা হয়। বলা হয়, এটা পড়ানোর মত অবস্থা ক্লাসে থাকে না, নেই বা তৈরী হয় নি। এটা সঠিক নয়। এই অংশটি শুধু মাত্র পরীক্ষা পাশের জন্যই নয়, জীবনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। তাই বয়ঃসন্ধিকল বা প্রজনন স্বাস্থ্য অংশটিকে ক্লাসে পড়ানোর ব্যবস্থা করা অবশ্যই দরকার।

**কোন কোন আইনে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের কথা বলা আছে-**

**ধারা-২২: ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার**

১. বসবাসের স্থানে কিংবা অবস্থা নির্বিশেষে কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তার গৃহে, পরিবারে বা যোগাযোগ বা অন্যান্য ধরনের তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কোনরূপ বলপূর্বক, বে-আইনী অনুপ্রবেশ অথবা অযাচিত হস্তক্ষেপ করা যাবে না। তার সম্মান ও সুনামের উপরও কোনরূপ বে-আইনী আক্রমণ করা যাবে না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এ ধরনের হস্তক্ষেপ ও আক্রমণ থেকে আইনী সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে।
২. শরিক রাষ্ট্র অন্যান্যের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত, স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করবে।

**ধারা-২৫: স্বাস্থ্য**

প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনরূপ বৈষম্য না করে শরিক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সর্বাধিক অর্জনযোগ্যমানের স্বাস্থ্য লাভের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। শরিক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী স্বাস্থ্য-বিষয়ক পুনর্বাসনসহ লিঙ্গ-ভিত্তিক সামাজিক অসমতার প্রতি সংবেদনশীল স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির সকল উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সুনির্দিষ্টভাবে শরিক রাষ্ট্র :

(ক) অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে একই ধরন, একই গুণ ও মানসম্পন্ন বিনামূল্যের বা স্বল্পব্যয়ী স্বাস্থ্য কর্মসূচি গ্রহণ ও সেবা প্রদান করবে। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং জনস্বাস্থ্য এই কর্মসূচি ও সেবায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে প্রতিবন্ধিতার কারণে প্রয়োজনীয় বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবে। ত্বরিৎ শনাক্তকরণ, উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং শিশু ও প্রবীণসহ সকলের অধিকতর প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকি হ্রাস ও প্রতিরোধ এই সেবায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

(গ) গ্রামীণ এলাকাসহ সর্বত্র যতদূর সম্ভব গ্রহীতার নিজ-এলাকাতেই এই স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবে;

(ঘ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে অন্যান্যদের মত সম-মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের জন্য পেশাদার স্বাস্থ্যকর্মী তৈরি করবে। সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও নৈতিক মান নির্ধারণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের মানবাধিকার, আত্মমর্যাদা, স্বাধিকার এবং বিশেষ চাহিদা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করে তাদের অবাধ ও সচেতন-সম্মতির ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবে;

(ঙ) স্থানীয় আইন অনুযায়ী স্বাস্থ্য বীমা ও জীবন বীমার ব্যবস্থা করে এবং তা ন্যায্য ও যৌক্তিকভাবে প্রদান করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বৈষম্য দূর করবে;

(চ) প্রতিবন্ধিতার কারণে খাদ্য ও পানীয় অথবা স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে বৈষম্য বিলোপ করবে।

# দ্বিতীয় অধ্যায় (Chapter Two)

## সেক্স ও জেন্ডার

## (Sex and Gender)

**যৌনতা বা সেক্স:** যৌনতা হচ্ছে সামগ্রিকভাবে একজন মানুষের অন্তর্নিহীত বিষয়, যেমন: জীবন এবং তাকে জড়িয়ে থাকা যৌন সম্পর্ক, জেন্ডার পরিচিতি ও তার ভূমিকাসমূহ, লৈঙ্গিক পরিচয়, যৌন প্রবৃত্তি, আনন্দ, ঘনিষ্ঠতা ও প্রজনন, কল্পনা বিলাস, আকাঙ্খা, বিশ্বাসসমূহ, দৃষ্টিভঙ্গী, মূল্যবোধ, আচরণসমূহ, ভূমিকা ও সম্পর্কসমূহ, চিন্তার মধ্যে যৌনতার অভিজ্ঞতা লাভ এবং তার প্রকাশ। যৌনতার মধ্যে এই সব বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তবে এগুলোর সবগুলো সম্পর্কেই অভিজ্ঞতা পাওয়া যায় না অথবা প্রকাশিতও হয়না। যৌনতার বিষয়টি নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ( বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, খসড়া কার্যকর সংজ্ঞা এবং অক্টোবর -২০০২) দিয়ে প্রভাবিত হয়, সেগুলো হচ্ছে জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সংস্কৃতিক, নৈতিক, আইনগত, ঐতিহাসিক, ধর্মীয় এবং আধ্যাতিক বিষয়গুলোর মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক।

**জেন্ডার:** জেন্ডার একটি পুরাতন শব্দ যা নতুন অর্থ ধারণ করেছে। এটি আন্তসম্পর্কযুক্ত, একগুচ্ছ ধারণাভিত্তিক একটি শব্দ। কারণ শব্দটির এই ব্যবহার নতুন। অনেকটা সর্টহ্যান্ডের মতো যা অনুবাদ করা কঠিন। জেন্ডার সম্পর্কে সংজ্ঞা বলতে গেলে বলতে হয় যে, এটি পুরুষ ও নারীর মধ্যে আচরণগত পার্থক্যসমূহ যেগুলো সামাজিকভাবে নির্মিত। এই পার্থক্যগুলো জৈবিক নয় তবে সেগুলো মানুষেরই সৃষ্ট পার্থক্য। জেন্ডার কোন স্থায়ী বিষয় নয়; এটা পরিবর্তন করা যায় বা বদলিয়ে ফেলা যায়। জেন্ডার পরিচিতি জৈবিক অথবা লৈঙ্গিক পরিচয় থেকে ভিন্ন। জৈবিক পরিচয় বাইরে থেকে শারীরিকভাবেই দৃশ্যমান হয়ে থাকে অপরদিকে জেন্ডার পরিচিতি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ আবেগ অথবা মনস্তাত্ত্বিক বিষয় অথবা পৃথক পৃথক কোন ব্যক্তি বিশেষের রুচি বা পছন্দের উপর সেটা নির্ভর করে। কোন একজন পুরুষ বা মেয়ে হয়ে জন্মালে তারা তাদেরকে জৈবিক ভাবে চিহ্নিত করতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে, জেন্ডার পরিচিতি কেবল নারী ও পুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এখন সারা বিশ্বেই অন্যান্য জেন্ডার পরিচিতি রয়েছে, তবে সেগুলোকে বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে অভিহিত বা চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এটি জেন্ডার-সচেতনতা যাচাই নয়। এটি মূলত কোন পরীক্ষাও নয়। মানুষের ভূমিকা এবং কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের প্রাথমিক চিন্তা জানার একটি উপায় মাত্র।

**জেন্ডার ও সেক্স এর মধ্যে পার্থক্য:** জৈবিক ভাবে সৃষ্ট-নারী পুরুষের বৈশিষ্ট্য সূচক ভিন্নতা বা শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নারী- পুরুষের স্বাতন্ত্র্যতা কিংবা শরীরবৃত্তীয়ভাবে নির্ধারিত নারী- পুরুষের বৈশিষ্ট্য যা অপরিবর্তণীয়। সেক্স বা লিঙ্গ হচ্ছে নারীত্ব ও পুরুষত্বের (Femaleness & Maleness) জৈবিক বা শারীরিক উপাদান, আর নারী ও পুরুষ সম্বন্ধীয় মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকবোধ হচ্ছে জেন্ডার। উন্নয়ন কর্মকান্ডে তাই আজ জেন্ডার এবং সেক্সের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য টানা হয়।

| সেক্স বা জৈব লিঙ্গ | জেন্ডার বা সামাজিক লিঙ্গ |
|---|---|
| • শারীরিক/জৈবিক | • সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক |
| • সার্বজনীন | • সমাজ সংস্কৃতি ভেদে ভিন্ন |
| • অপরিবর্তনীয় | • পরিবর্তনযোগ্য |
| • প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট | • সমাজ-সংস্কৃতি থেকে গৃহীত |

জেন্ডার সম্পর্ক সংস্কৃতি, জাতি, ধর্ম, শ্রেণী ভেদে ভিন্ন। সমাজে ভিন্ন ভিন্ন রকম হলেও গোটা বিশ্বজুড়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সাধারণত অভিন্ন অবস্থা বিদ্যমান। এগুলো হল নারী-পুরুষের দৈনন্দিন কাজ, দায়-দায়িত্ব ব্যবহৃত সময়ের ক্ষেত্রে ভিন্নতা বা অসমতা অর্থাৎ জেন্ডার ভিত্তিক শ্রম বিভাগ। দ্বিতীয়ত পুরুষের তুলনায় সম্পত্তি, অধিকার , পছন্দ ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ, সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর অধিকারহীনতা বা সুযোগের অভাব অর্থাৎ সমাজে নারীর অমর্যাদাজনক বা অধস্তন অবস্থানে রয়েছে। 'সেক্স' কি আলোচনা করতে দেখে বিস্মিত এবং কৌতুহলী হয়ে উঠে প্রায় সকল বয়সের নারী-পুরুষ। প্রকৃত অর্থে সেক্স এবং জেন্ডারের পার্থক্য যাচাই করা হয় এবং এই পার্থক্য বুঝে জেন্ডারের ধারণা নেওয়া তারপর আমাদের অনুধাবন করা প্রয়োজন কিভাবে নারী-পুরুষ, বালক-বালিকার ওপর উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রভাব পড়ে।

সেক্স লিঙ্গ একটি জৈবিক সত্তা। মানুষ নারী অথবা পুরুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করে; পুরুষ সন্তান জন্ম দেয়ার জন্য বীর্য দেয়, নারী সন্তান গর্ভে ধারণ করে, সন্তান জন্ম দেয়, মানবশিশুকে পৃথিবীতে স্থাপন করায়। এই শারীরিক পার্থক্যের ওপর নির্ভর করে আমরা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যবহার এবং কর্মকান্ড তৈরী করি- এগুলোই আমাদের জেন্ডার ভূমিকা এবং পরিচয়। তাই এসবকে প্রশ্ন করার অর্থ আমাদের বোঝাপড়ার ভিত্তি, আমাদের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক সম্পর্ক, আমাদের সংস্কৃতি ও পরস্পর্কে আক্রমণ করা।

**ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ:** ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ দূর করতে প্রয়োজন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। যেসব শিশু নারী-পুরুষ বিভেদ বা বৈষম্যপূর্ণ পরিবেশে বড় হয় তারাই পরবর্তীতে নারী-পুরুষের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করে বেশি। আমাদের সমাজে একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে যে, মেয়েরা জন্মগতভাবে একটু নরম-শরম স্বভাবের হয় আর ছেলেরা হয় একটু ডানপিটে স্বভাবের। এমনকি একটি ছেলে শিশু ও একটি মেয়ে শিশুর আচার-আচরণ লক্ষ্য করলেও এমন চিত্রই ফুটে উঠে। আমাদের শৈশবের দিকে ফিওে তাকালেই দেখতে পাই, মেয়ে শিশুদের কখনও গাড়ি বা ফুটবল জাতীয় খেলনা দেওয়া হয় না। মেয়েদের শৈশব কাটে হাড়ি-পাতিল, পুতুল, বৌচি, গোল্লাছুট খেলা খেলে। ছেলে আর মেয়ে শিশুর মধ্যে দৃশ্যমান একটি পার্থক্য আছে সেটি শুধুই শারীরিক। কিন্তু মানুষের শরীর তো পরিচালিত হয় মস্তিষ্ক দ্বারা আর এই মস্তিষ্কে শিশুকালেই ঢুকিয়ে দেয়া হয় নারী-পুরুষের বিভেদ।

**ছেলেদের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ:** আমাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থা প্রধানত পুরুষতান্ত্রিক বা পিতৃতান্ত্রিক। আর তাই ছোটবেলা থেকেই মেয়ে শিশুর তুলনাই ছেলে শিশুকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়। সুতরাং শতবর্ষ আগে বেগম রোকেয়া নারী-পুরুষের যে সমতার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে স্বপ্ন আজ শত বছর পরও আমরা সফল করতে পারি নি আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়। ছেলেদের যেরকম হতে হবে তা হল-

- ছেলেদের দৈহিক শক্তিতে বলীয়ান হতে হবে বা সুঠাম দেহকাঠামো হবে
- ছেলেরা ভারী কাজ-কর্ম করবে
- ছেলেরা পরিবারের প্রধান হবে
- উপার্জনক্ষম হবে
- যেকোনো বিষয়ে পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত নিতে পারবে
- রাত্রিবেলায় বাইরে নির্ভয়ে চলাফেরা করতে পারবে
- ছেলেরা হাট-বাজার করবে
- রাজনীতিবিদ হতে পারবে ইত্যাদি।

**মেয়ের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ:** আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এমন কতগুলো রীতিনীতি ও প্রথা বিরাজমান যা পিতৃতান্ত্রিক ভাবাবেগে তৈরি। যেমন-

- মেয়েদের জোরে কথা বলতে নেই
- নারীদের পুরুষের আগে খাওয়া ঠিক না
- মেয়েরা ছোটবেলা থেকে পুতুল ও রান্নাবাটি খেলবে
- মেয়েরা মার্জিত পোশাক পরবে
- নারীদের জেদ করতে নেই
- মেয়েরা লম্বা চুল রাখবে
- ঋতুমতি মেয়েদের কোন কিছু ধরতে নেই ইত্যাদি।

ছোট বেলা থেকেই মানুষ এসকল সামাজিক রীতিনীতি দেখতে ও মেনে চলতে অভ্যস্ত। এভাবে অব্যাহত চর্চার ফলে রীতিনীতিগুলো শক্ত ভিত পেয়ে যায়। যা ধীরে ধীরে নারীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ হিসেবে ভাবতে শেখায়।

**বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণে করণীয়:** মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে মানুষ বসবাস করে আসছে পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে; আর তাই এই সমাজে বসবাস করে হরেক রকমের মানুষ এবং মানুষের মধ্যে যে বৈষম্যাদি আছে তা আমাদের মননে চিন্তা, চেতনায় ও বাক বিনিময়ে এ বিষয়টিকে অতি সতর্কভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

# তৃতীয় অধ্যায় (Chapter Three)
## যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার
(Sex and Reproductive Health and Rights)

### স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থ অবস্থা; শুধুমাত্র রোগের অনুপস্থিতি বা অসুস্থতা নয়। স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক অধিকার এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে স্বাস্থ্য সূচক সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত (**সূত্র: আলমা আতা, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ৩১ তম স্বাস্থ্যনীতি সম্মেলন**)। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা কৈশোরে অনেকেই বিবাহিত বা বিবাহ বর্হিভূত যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে প্রজনন স্বাস্য বা যৌনতা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে তারা অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণ করে ফলে অনিরাপদ গর্ভপাতের কারণে অনেক কিশোরী মৃত্যুবরণ করে। পরবর্তীতে বন্ধ্যাত্ব দেখা দিতে পারে প্রজননতন্ত্রের প্রদাহের ফলে। তাছাড়াও অজ্ঞতার কারণে এইচ আইভি বা এইড্স এ আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি এ বয়সে বেশী হয়ে থাকে। আর তাই এই বয়সে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিশোর কিশোরীদের জানা প্রয়োজন। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার অথবা এসআরএইচআর হচ্ছে সার্বজনীন মানবাধিকারের অংশ যা যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটি চারটি পৃথক উপাদানের বিভিন্ন বিষয়কে নিয়ে আবর্তিত হয়ে থাকে। উপাদানগুলো হচ্ছে ১. যৌন স্বাস্থ্য, ২. যৌন অধিকার, ৩. প্রজনন স্বাস্থ্য এবং প্রজনন অধিকারসমূহ। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৪৩ শতাংশ জনগণের বয়স ১৫ বছরের নিচে (WHO-২০০৭)। আর এ বিপুল সংখ্যক কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালে স্বাস্থ্য ঝুঁকিও থাকে অনেক বেশি। বাংলাদেশে ২০-২৪ বছর বয়সী নারীদের ১৮ বছরের পূর্বে বিবাহিত ৬৬% নারী ২০১১ (আইসিআরডাব্লিউ- ইউনিসেফ) এবং ৪৮% নারী (জাতিসংঘ)। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার বয়স-বয়ঃসন্ধিকালেই যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিশোর-কিশোরীদের জানা প্রয়োজন অর্থাৎ ১০-১৪ বছর বয়সে এসব সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবাকে পৃথক উপাদানের বিভিন্ন বিষয়কে নিয়ে আবর্তিত হয়ে থাকে। নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর ধারাবাহিকের একটি অংশ ধাপসমূহ হচ্ছে-

- ভ্রুণ
- ফেটাস
- নবজাতক
- সদ্য চলনক্ষম শিশু
- প্রাথমিক শৈশবকাল (শিশু)
  প্রাক-কৈশোর
- কৈশোর
- প্রাপ্তবয়স্ক
- মধ্যবয়স
- বৃদ্ধবয়স

জীব বিজ্ঞানের ভাষায়

- নিষেক
- প্রসব
- হাঁটা
- ভাষা জ্ঞান অর্জন
- বয়ঃসন্ধি
- বয়সবৃদ্ধি
- মৃত্যু

**অধিকার**

অধিকার হচ্ছে ক্রমবর্ধমান একগুচ্ছ অধিকারের সমষ্টি যা সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত সুযোগ-সুবিধা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। যেখানে কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। রাষ্ট্র প্রদত্ত সকল অধিকার যেমন-মৌলিক অধিকার, সামাজিক অধিকার, আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করে থাকে। রাষ্টের নাগরিক হিসেবে যে ব্যক্তি সম্মান ও মর্যাদা পেয়ে থাকে। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৬ থেকে ৪৭ অনুচ্ছেদে সকল ধরনের মৌলিক অধিকারের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অপ-অধিকার আসে মূলত প্রভুত্ব, দখলদারিত্ব, স্বামিত্ব, ভয়, লোভ-লালসা, ক্ষমতার অপব্যবহার, সর্বোপরি অভিজ্ঞতার ও প্রজ্ঞার কোনো বিষয়ে অজুহাত দেখিয়ে অধিকারের অপব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের ১০২ (১) অনুচ্ছেদে অধিকার লঙ্ঘিত হলে কি করণীয় তাও উল্লেখ করা আছে।

**যৌন স্বাস্থ্য কী:** যৌন স্বাস্থ্য হচ্ছে যৌনতার সাথে সম্পৃক্ত শারীরিক, আবেগপ্রবণতা, মানসিক ও সামাজিক কল্যাণের একটি অবস্থা; এটা কেবলই রোগ না থাকা, শরীর ঠিকমতো কাজ না করা অথবা কোন প্রকার শারীরিক দুর্বলতা না থাকাকে বুঝায় না। যৌন স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্যে প্রয়োজন যৌন ও যৌনতার সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক ও সম্মানজনক ধারণা পোষণ করা এবং একই সাথে কোন প্রকার বল প্রয়োগ ব্যতিরেকে সম্ভাব্য আনন্দদায়ক ও নিরাপদ যৌন অভিজ্ঞতা লাভ করা।

**যৌন স্বাস্থ্য অধিকার:** যৌন স্বাস্থ্য অধিকার বলতে সেই স্বাস্থ্যকে বুঝায় যার মাধ্যমে মানুষ সুস্থ ও নিরাপদভাবে শারীরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে, সুস্থভাবে সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা রাখে, পুরুষত্ব ও নারীত্বের সামগ্রিক স্বাস্থ্য স্বীকৃতি লাভ করে। যৌন স্বাস্থ্য অধিকার হলো নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে যৌন ও প্রজনন সংক্রান্ত যেকোনো প্রসঙ্গে নিজস্ব সম্মতি ও নির্বাচনের অধিকার। যৌন স্বাস্থ্য অধিকার শুধুমাত্র প্রজননতন্ত্রের কার্য এবং প্রজনন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। যৌন স্বাস্থ্য অধিকারগুলো হচ্ছে-

- জনগনের সন্তোষজনক ও নিরাপদ যৌন জীবনের অধিকার
- সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা এবং কখন কিভাবে তা সম্পাদিত হবে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতার অধিকার
- প্রজনন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইন বিরুদ্ধ হবে না এমন নিরাপদ কার্যকরী, সাধ্যায়াত্ত এবং গ্রহণযোগ্য পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি জানার এবং পছন্দমত বেছে নেওয়ার অধিকার
- নিরাপদ মাতৃত্বের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা পাওয়ার অধিকার
- প্রয়োজনমত যৌনবাহিত রোগের চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার

**যৌন অধিকার:** যৌন অধিকার হচ্ছে ক্রমবর্ধমান একগুচ্ছ অধিকারের সমষ্টি, যেগুলো যৌনতার সাথে সম্পৃক্ত। এই অধিকারগুলো আপনাকে আমাদের লৈঙ্গিগতা দিয়ে সঙ্গীদের ব্যাপারে, গোপনীয়তা ও আনন্দলাভের বিষয়ে নিজের সিদ্ধান্ত নিতে সহায়ক হবে। যৌন অধিকার আবার মানবাধিকারও, এর অর্থ হচ্ছে দেশের নাগরিক হিসেবে কেউই কেবলমাত্র তার লৈঙ্গিক পরিচিতি ও জেন্ডার পরিচয়ের কারণে আনন্দ পাবার ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। এর উপর WAS (World Congrase of Sexuality) ১৯৯৯ সালে হংকংয়ে অনুষ্ঠিত যৌন তত্ত্বের উপর চতুর্দশ বিশ্ব কংগ্রেসে যৌন অধিকার সম্পর্কে একটি সার্বজনীন ঘোষনাপত্র গ্রহণ করে, যার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে নিম্নোক্ত যৌন অধিকারসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অধিকারগুলো হচ্ছে:

- যৌন স্বাধীনতা
- যৌন স্বায়ত্বশাসন, যৌন অখন্ডতা এবং জননাঙ্গের নিরাপত্তা
- ইচ্ছাধীন ও দায়িত্বশীল প্রজনন পছন্দ করতে পারার স্বাধীনতা
- বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান মূলক যৌনতা বিষয়ক তথ্য পাবার নিশ্চয়তা

- যৌন আনন্দ পাবার ক্ষেত্রে যৌন সমতা বিধান
- আবেগ সম্বলিত যৌন সম্পর্কের প্রকাশ
- ইচ্ছাধীন যৌন সহযোগী নির্বাচন
- সামগ্রিকভাবে যৌনতা সম্পর্কে শিক্ষার নিশ্চয়তা

*তথ্যসূত্র: জেন্ডার ইস্যু, প্রজনন স্বাস্থ্য সহায়িকা*

**প্রজনন স্বাস্থ্য:** প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষা একটি সম্পূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও সামজিক ভাবে ভালো থাকার বিষয় এবং এটি শুধুই রোগ বা শারীরিক সমস্যা থাকার ওপর নির্ভর করেনা। প্রজনন স্বাস্থ্য বলতে প্রজনন প্রণালী এবং এর কার্যকলাপ ও প্রক্রিয়াসমূহের সাথে যুক্ত সকল বিষয়কেও বোঝায়। সুতরাং প্রজনন স্বাস্থ্য বলতে আমরা বুঝি যেকোন মানুষ সন্তোষজনক ও নিরাপদ যৌন যাপন করতে পারছে এবং একই সাথে তাদের প্রজননের ক্ষমতা রয়েছে এবং এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা রয়েছে। প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলো হচ্ছে-পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি, স্বাস্থ্যবিধিসম্মত ব্যবস্থা, পরিচর্যা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি।

**৩.৫ প্রজনন স্বাস্থ্যের উপাদান:** প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা মূলত শিশু জন্মের পর থেকে শুরু হয়। প্রজনন স্বাস্থ্যের উপাদান সমূহ:

- নিরাপদ মাতৃত্ব
- পরিবার পরিকল্পনা
- ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভপাত রোধ করা
- পুরুষ সমাজের দায়িত্বপূর্ণ আচরণ
- প্রজনন অঙ্গ সংক্রমণের চিকিৎসা
- যৌনবাহিত রোগের কার্যকর প্রতিরোধ
- কিশোর-কিশোরী প্রজনন স্বাস্থ্য

**প্রজনন স্বাস্থ্য সেবায় গুরুত্বপূর্ণ ৮ টি উপাদান:**

১. **নিরাপদ মাতৃত্ব (প্রসবের পূর্বে পরিচর্যা, প্রসাবত্তোর পরিচর্যা, নিরাপদ প্রসাব, টিটি)** আমাদের দেশে জীবিত সন্তান প্রসাবে প্রতি লাখে ৩২০ জন মহিলা গর্ভ ও প্রসব কালীন সময় মারা যায়।

২. **নবজাতকের পরিচর্যা:** প্রসূতি মায়ের পাশাপাশি নবজাতকের যত্ন নেওয়া উচিৎ।

৩. **পরিবার পরিকল্পনা:** পরিকল্পিত পরিবারের জন্য ক্লিনিকাল ও নন-ক্লিনিকাল সব ধারনের পদ্দতি সম্পর্কে জেনে উপযুক্ত পদ্দতি বেছে নিতে হবে।

৪. **মায়ের পুষ্টি:** একজন মায়ের পরিমিত ও পুষ্টিকর খাবার অত্যন্ত দরকার। সুস্থ মা মানেই স্বাস্থ্যবান শিশু।

৫. **ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভপাতরোধ ও পরবর্তী জটিলতা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা:** গর্ভপাত পরবর্তী জটিলতা সম্পর্কে জেনে দ্রুত সেবা নেওয়া প্রয়োজন।

৬. **আরটিআই/এসটিআই/এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ:** যৌনবাহিত রোগকে লজ্জার বিষয় মনে না করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণ করা উচিত।

৭. **কিশোর কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিচর্যা:** বয়ঃসন্ধিকালে জীবন গঠনের উপযুক্ত সময় তাই এ সময় থেকেই প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

৮. **বন্ধ্যাত্বতার চিকিৎসা:** আমাদের দেশে বন্ধাত্ব নিয়ে নানা ধারনের কুসংস্কার আর ভুল ধারণা প্রচলিত আছে, যে কারণে অনেক পরিবারে অশান্তি বিরাজ করে। তাই এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা প্রত্যেকের জন্য জরুরি।

**প্রজনন অধিকার**

প্রজনন অধিকার হলো কখন সন্তান গ্রহন করবে সেই সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার। প্রজনন অধিকার বলতে শুধু নারীর নয়, বরং নারী ও পুরুষ উভয়েরই শরীর ও মনকে নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে বুঝায়। একটি জুটিকে অবশ্যই তাদের সন্তান নেয়ার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা করার এবং যথেষ্ঠ অবহিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করার সুযোগ দিতে হবে। তবে এটা যে সবসময়ই সম্ভব হবে তা নয় কারণ, অনেক দেশেই শিক্ষার সীমাবদ্ধতার ফলে এবং পরিবার পরিকল্পনার উপকরণ পাবার ক্ষেত্রে অসুবিধার কারণে এরকম ভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়না। প্রজনন অধিকারের মধ্যে আরো রয়েছে পরিবার পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত নেয়ার সময়ে বৈষম্য তৈরী, বলপ্রয়োগ করা বা সহিংসতার শিকার হওয়া থেকে মুক্তি পাওয়া।

**কিশোর কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা**

কিশোর কিশোরীদের সুস্বাস্থ্যের জন্য অন্যন্য স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি প্রজনন স্বাস্থ্য সেবাও গ্রহণ করা জরুরী। সময়মত ও সঠিক প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অভাবে কিশোর-কিশোরীরা মারাত্বক জটিলতার সম্মুখিন হতে পারে। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় কিশোর কিশোরীরা লজ্জা-সংকোচ বা ভয়ে প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যা বিষয়গুলো নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। কখনও কখনও তারা হাতুড়ে ডাক্তার কবিরাজ বা ওঝার স্মরণাপন্ন হয়, এতে তারা ভুল চিকিৎসা ও প্রতারণার শিকার হয়। আমাদের দেশের বেশিরভাগ মেয়েদের কৈশরে বিয়ে হয়ে থাকে। এজন্য প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার প্রয়োজন। সাধারণত কিশোর কিশোরীদের জন্য সে ধরনের প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার প্রয়োজন হয় সেগুলো হল:

- প্রজননস্বাস্থ্য বিষয়ে তথ্য ও পরামর্শ
- প্রজননতন্ত্রের সংক্রামণ ও যৌনরোগের চিকিৎসা
- পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সেবা
- গর্ভাবস্থায়, প্রসবের সময় ও প্রসব পরবর্তী সেবা

# চতুর্থ অধ্যায় (Chapter Four)
## যৌন হয়রানি
## (Sexual harassment)

**যৌন হয়রানি কী**

নারী নির্যাতনের কথা আলোচনা করতে হলে প্রথমে কয়েকটি স্বজাতীয় টার্ম বা শব্দ সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার হতে হবে। যেমন যৌন হয়রানি (Sexual Harrassment), উত্যক্ত করা বা ঠাট্টা মশকরা করা ও নির্যাতন (Violence)। দুজন মানুষের মধ্যকার যৌন আকর্ষণের সাথে যৌন হয়রানির সম্পর্ক খুবই কম। বরঞ্চ যৌন পক্ষপাতিত্ব, অসন্তোষজনক ও নিন্দনীয় মন্তব্য, হাবভাব অথবা স্পর্শ এর আওতাভুক্ত। বৈষম্য সৃষ্টির এটা এক ধরণের কৌশল এবং এর দ্বারা ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়। ( Equal Opportunity Research Project, University of Cape Town; থেকে নেয়া) এটা ব্যক্তির ব্যক্তিস্বত্তার উপর আঘাত হানে। ঠাট্টা মশকরা সাধারণতঃ বন্ধুরা বন্ধুদের করে থাকে। খুব নিকট বন্ধুদের সাথে আমরা ঠাট্টা মশকরা করি, বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। যেমন, কোন কাজ, কোন অভ্যাস যা আমাদের চোখে বেখাপ্পা ঠেকে তা নিয়ে আমরা তাৎক্ষনিকভাবে ঠাট্টা মশকরা করে থাকি। অনেক সময় সুন্দর চেহারা নিয়ে, শারীরিক গঠন নিয়েও ঠাট্টা মশকরা করা হয়। মশকরাকারীকে যদি আমরা দাতা ও মশকরা গ্রহণকারীকে যদি আমরা গ্রহীতা বলি তবে এই ঠাট্টা মশকরার ফলাফল নির্ভর করে দাতা ও গ্রহীতার সম্পর্কের উপর।

- যদি সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ হয় তবে ঠাট্টা-মশকরার মাত্রা বাড়ানো যায় অন্যথায় সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ না হলে ঠাট্টা মশকরা গ্রহীতার কাছে গ্রহণযোগ্য না হয়ে বরং অপমানজনক মনে হতে পারে।
- এছাড়াও, ক্ষমতার বৈষম্যের উপর ঠাট্টা মশকরার মাত্রা ও প্রতিক্রিয়া নির্ভরশীল। প্রায়ই তা করা হয় নিজের ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ দেখানোর উদ্দেশ্যে।

কাজেই দাতা ও গ্রহীতার অবস্থানের উপরও এর প্রভাব অনেক বেশী নির্ভর করে। যেমন বউ পেটানো, দোররা মারা ইত্যাদি। এসবের মূল অন্তর্নির্হিত ধারণা হচ্ছে ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণের প্রতিফলন ঘটানো।

কাজেই এ ব্যাপারে সাধারণতঃ প্রত্যেকেই সম্পর্কের মাত্রা অনুযায়ী ঠাট্টা মশকরা করে থাকেন। স্কুল কলেজ অফিস আদালতের সবক্ষেত্রেই বন্ধুরা বন্ধুদের মাত্রা অনুযায়ী ঠাট্টা মশকরা করে থাকেন। অসুবিধা তখনই হয় যখন দাতা ও গ্রহীতার মাঝে সম্পর্ক ঠাট্টা মশকরার পর্যায়ে না হয় এবং দাতা পক্ষ যদি সে ব্যাপারে ওয়াকিবহাল না থাকেন। উদাহরণস্বরূপঃ সহকর্মী মনি অবিবাহিতা, পারিবারিক দায়দায়িত্ব তেমন নেই বলে দৃশ্যত মনে হয়। কাজেই যখনই উনি মাসিক বেতন উঠান আমি দেখলেই বলি, মনি আপা আপনার টাকা পয়সার কি দরকার। নিশ্চয় শাড়ী কেনার জন্যে বেতন তোলেন। যদি মনি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব পর্যায়ে না পড়েন তবে এটা বলা অন্যায়।

কেন না এমন অনেক পুরুষ সহকর্মী আছেন যারা আমার চোখের সামনে বেতন তুললেও কখনও আমি তাদেরকে ওরকম মন্তব্য করি না। কারণ চাকুরী করা ও বেতন তোলা পুরুষালী কাজ বলে আমাদের ধারণা যাকে, বলা যায় যৌন পক্ষপাতিত্ব। কিন্তু মহিলার বেলায় এটা মনে হয় অনর্থক বা অযাচিত কাজ। কাজেই তাকে শাড়ী কাপড়ের কথা বলে ব্যঙ্গ করতে আমার বাধে না। অথচ এটা অন্যায় এবং এটা মশকরার পর্যায়ে পড়ে। মহিলাদের নিয়ন্ত্রণে ও অবদমনে রাখার জন্যে সমাজে কিছু সুক্ষ কৌশল কাজ করে যার শুরু হয় হালকা ঠাট্টা মশকরা (Harassment) দিয়ে কিন্তু তার মাত্রা শারীরিক (Physical) ও জৈবিক (sexual) অপমান পর্যন্ত গড়ায়। সাধারণত যা আমরা নিত্যদিন শুনতে পাই তা হলো মহিলাদের গায়ের রং, সৌন্দর্য ইত্যাদি নিয়ে মতামত, কাপড় জামা, শাড়ী নিয়ে অহেতুক মন্তব্য করা। একজনকে (সে মহিলা বা পুরুষ হোক) সুন্দর, স্মার্ট কাপড় পড়ার জন্য যে কোন সময়ই প্রশংসা করা যায় যদি সম্পর্কটা সেরকম হয় সেক্ষেত্রে একটা মার্জিত ঘনিষ্ঠতা থেকে মন্তব্য করা হয়। কিন্তু যখনই এই মন্তব্য করা হয় কোন বিশেষ ব্যক্তিকে প্রায় প্রতিদিনই তখন তা গ্রহীতার জন্য বিরক্তিকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই এর মাত্রা জানতে হবে। এজন্য ব্যবহার করতে হবে উপস্থিত বুদ্ধি, সমমর্মিতা। আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে এমন কোন মন্তব্য করা থেকে যেন আমরা বিরত থাকি যে মন্তব্য কোন মানুষকে শুধুমাত্র সে মহিলা বলে বা পুরুষ বলেই

করা হয়। এটা হতে পারে ব্যক্তির স্বভাব, অভ্যাস, রুচি, পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে, অথবা তার গঠন প্রকৃতি, কাপড় চোপড়, দক্ষতা- অদক্ষতা, কাজের প্রকৃতি নিয়ে কিংবা শারিরীক সম্পর্ক নিয়ে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি মন্তব্য বা ব্যবহার তুলে ধরছি।

- এসব কাজ মেয়েদের মানায় না।
- (মহিলা সহকর্মীকে) ভাইয়ের কাছে আপনিই যান, মেয়ে দেখলে ভাই কিছু বলে না। কিংবা পুরুষদের কঠিন বা জরুরী কাজে পাঠানো। যেমন- কাজটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, ছেলেমেদেরই করা উচিত।
- এখনতো আপাদেরই সময় (মহিলাকে)
- রাস্ততায় পথ আগলে দাঁড়ানো।
- আপনারা থাকলে অফিসের চেহারাই বদলে যায়।
- অফিসের কাজ করলে ভালো শাড়ী কাপড় পড়ে আসা উচিৎ।
- আপনি যা করেন আপা, আমার বোন হলে তা করতে দিতাম না। ইত্যাদি।

এভাবে দেখা যায় আমাদের অচেতন মনে আমরা অনেক কাজ করি বা কথা বলি যা বলার সময় আমরা স্থান কাল পাত্রের ভেদাভেদ করতে ভুলে যাই। যেহেতু মা বোন এবং ভাবীর উপর কর্তৃত্ব সব বাবা, ভাইরাই কম বেশী করে থাকেন কাজেই আমরা সংস্থাতে এসেও মহিলা সহকর্মীর সাথে একই সুরে কথা বলতে দ্বিধা করি না। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে সহকর্মী সে পুরুষই হোক আর মহিলাই হোক সকলই সমান। তারা আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা আত্মীয় নয়। কাজেই এখানে আচার ব্যবহারে এমন কেনা কিছু প্রকাশ করা সমীচিন হবে না যা আমার সহকর্মীর সমতার সম্পর্ককে হীন করে।

এ কথা পুরুষ মহিলা উভয়ের জন্যেই প্রয়োজ্য। আমরা পুরুষরা যেমন মহিলা কর্মীর সাথে কর্মময় সম্পর্কে অভ্যস্থ নই, তেমনি মহিলা কর্মীও অনেক সময় বুঝতে পারেন না কোন ব্যবহারটি এখানে যুক্তিযুক্ত। কাজেই অনেক সময়ই মহিলারা হয়তো পুরুষ কর্মীকে অতিরিক্ত মান্যগণ্য করেন। নয়তো বা উল্টোটাও হতে পারে। এবং পুরুষরা মহিলা কর্মীকে বোনের মত মনে করে তার কথায় কর্ণপাত কম করেন, এমনকি তার কথাকে মর্যাদাও কম দেন। যার প্রতিফলনে মিটিংয়ে মেয়েদের অংশগ্রহণ কমে যায়, যাও বা অংশগ্রহণ তারা করে থাকেন তাও আবার গ্রাহ্যের মধ্যে আনা হয় না। এতে মেয়েদের নিজেদের মতামতের উপর ভরসা কমে যায়। তারা সম্মানহীনতার ভোগে, পুরুসের মতামতকে মেনে নেয় (ভুল হলেও) নিজেকে সব সময় দূর্বল মনে করে। লোক সম্মুখে কথা বলতে সংকোচ বোধ করে। তাদের গলা আমরা শুনতে পাইনা/চাই না। অনেক সময়ই তাদের পক্ষে হয়ে অন্য কেউ অভিমত (Judgement) দিয়ে দিই। এভাবে কখনও শোনাতে না পেরে কখনও অসদব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে মহিলারা চাকুরীও ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

পুরুষ কর্মী ও মহিলা কর্মীকে আলাদা ভাবে দেখা, মহিলা কর্মীকে শোভা হিসেবে চিন্তা বা ব্যবহার করা, অযাচিত শারীরিক সম্পর্ক সৃষ্টির চেষ্টা করা, সবই Harassment এর আওতায় পড়ে। কাজেই Harassment হতে পারে পরোক্ষভাবে আবার প্রত্যক্ষভাবেও মানসিক এবং শারীরিক দু ধরণের। মানসিক নির্যাতন আহত করে যা দেখা যায় না, শুধু অনুভব করা যায়।

অনেক সময় আমরা এমন সব মন্তব্য করি যাতে ব্যক্তিকে না বলে পুরুষ ও মহিলাদের সাধারণীকরণ (Generalization) করা হয়। যেমন, মেয়েদের আবার সময় জ্ঞান কি, পুরুষরা তড়িৎ , পুরুষরা কর্তব্যপরায়ন, মেয়ে মানেই লেট, মেয়েরাতো মেনে নিবেই ইত্যাদি। অনেক সময়ই এসব মন্তব্য করতে আমরা দ্বিধা করিনা। যে মহিলারা আমাদের সৃষ্ট এই পুরুষত্ব বা মেয়েলী ক্যাটাগরিতে পড়েন না, তাদেরকে আমরা সব সময় Exceptional বলে আলাদা করে রেখে এসব মন্তব্য করি। কিন্তু এ ব্যাপারে মনে রাখা উচিত যে, কোন মন্তব্য করার আগে ভেবে-চিন্তা করা উচিত এবং মহিলা বলে Generalization না করে ব্যক্তি হিসেবে মহিলাকে ভাবলে এ ধরণের মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকা সহজ হবে।

সব সময় আমাদের ব্যবহারই পরিচয় দেয় আমাদের মানসিকতার, আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনার। Exceptional যাদের বলি তাদের এই Exceptional হবার পেছনে কারণগুলো বিশ্লেষণ করলে হয়ত দেখা যাবে সমাজের বৈষম্যমূলক মনোভাবের শিকার তারা কিছুটা কম হয়েছে বলেই এদের ভিন্ন স্বভাব

চরিত্র হয়েছে। কাজেই মহিলা বলেই কেউ বোকা হয় না বা পুরুষ বলেই কেউ দায়িত্ববান হয়না। এর পেছনে সমাজের কিছু কারসাজি রয়েছে। এ জন্য এককভাবে পুরুষ মহিলাকে দোষারোপ করলে চলবে না এবং এ নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করার পূর্বে বিবেককে প্রশ্ন করতে হবে, যুক্তি খুঁজে নিতে হবে।

আমাদের ছোট ছোট কথাও যেন অন্যের জন্য নির্যাতনের কারণ না হয়। সচেতন উন্নয়ন কর্মীকে সজাগ থাকা উচিত ধর্ম, সংস্কৃতি, সামাজিকতা, স্থান ও সময়ের দোহাই দিয়ে এমন কোন কাজ বা মন্তব্য না করা, যা আরেকজন ব্যক্তির জন্য ( এ ক্ষেত্রে বিশেষ করে মহিলা) আত্মসম্মান বা রুচিহানীকর হয় । এমন কাজ বা ব্যবহার করার অপর নাম হচ্ছে ঠাট্টা-মশকরা আর এই ঠাট্টা মশকরা (Harassment) যখন মাত্রা অতিক্রম করে যায় তখন তা হয়রানী/নির্যাতনের পর্যায়ে পড়ে। জেন্ডার সচেতন ব্যক্তির কর্তব্য এসব আচার আচরণ শুদ্ধিকরণ এবং প্রয়োজনে প্রতিবাদ করা।

আপনার নিজ ব্যবহার যথাযথ কিনা তা যাচাইয়ের একটি উপায় হলো নিজের মনকে প্রশ্ন করা। কোন কোন মানুষকে আপনি Harass করেন ও কেন করেন? অথবা কোন ব্যক্তি আপনাকে Harass করে? কি সম্পর্ক তার সাথে আপনার? উর্দ্ধতন/অধঃস্তন/ ছোট/বড়? শ্রেণী বা পদ বৈষম্য? কেন করেন? ভাবুন এবং পরিহার করুন এমন কথা যা অন্যকে কষ্ট দেয়, পীড়া দেয়।

**ধর্ষণ: (নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধন ২০০৩)**

এই আইনের বিধান সাপেক্ষে ‘ধর্ষণ’ অর্থ যদি কোনো ব্যক্তি নিম্নোক্ত অবস্থায় কোনো নারীর সাথে যৌন সহবাস করে তাহলে সেই ব্যক্তি উক্ত নারী কে ধর্ষণ করেছে বলে গন্য হবে।

ধর্ষণ হচ্ছে একপ্রকার যৌন নির্যাতন। যা একজন সঙ্গী বা সঙ্গিনীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা বিনা অনুমতিতে যৌনাঙ্গের মিলন ঘটিয়ে যৌন সংগমে লিপ্ত হওয়াকে ধর্ষণ বলা হয়। সাধারণভাবে ধর্ষণ বলতে বোঝায় নারী বা পুরুষ যেকোনো একজনের অমতে জোরপূর্বক যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা। তবে আমরা যে সমাজে বসবাস করি তার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ষণের শিকার শুধুমাত্র নারীরা হয়ে থাকে। ধর্ষণ সম্পর্কে বাস্তবতা এবং লোকপুরাণসমূহ (Myth) ধর্ষণ সেই ধরণের একটি অপরাধ যা সম্পর্কে মানুষের নানা আবেগজাত প্রতিক্রিয়া ঘটে। কেউ কেউ এমন কি এভাবেও ভেবে থাকেন যে, ধর্ষণ আসলে অসম্ভব। কোন নারী না-চাইলে তাকে ধর্ষণ করা যায় না। যখন একজন ধর্ষিতা পুলিশ স্টেশন বা কোর্টে যায় তখন তাকে প্রমাণ করতে হয় যে, সে কোনভাবেই ধর্ষককে প্রলুব্ধ করেনি। নারীরা তাদের নীতিবোধ হারিয়ে ফেলছে বলেই বর্তমানে প্রচুর ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে।

মনোবিদরা বলেন সর্বক্ষেত্রেই ধর্ষকদের তিনটি ব্যাপার লক্ষনীয়ঃ ক্ষমতা (power), ক্রোধ (anger) এবং যৌনতা (sexuality)। এখানে আরেকটি ব্যাপার বলা দরকার সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ধর্ষণ শুধুমাত্র সম্পূর্ণ অপরিচিত কেউ করবে। এটা একেবারেই ভুল কথা। বেশিরভাগ ধর্ষণই হয় অত্যন্ত পরিচিত কারো দ্বারা। সংবাদপত্রে প্রতিদিনই যেসব ধর্ষণের ঘটনা দেখবেন, তার বেশিরভাগই লক্ষ করলে দেখবেন অমুক গ্রামের অমুকের পাশের বাড়ির অমুককে ধর্ষণ করেছে। এরা তাদের servivor-দের নিয়ে অনেকটা অসুস্থ ঘোর (unhealthy obession) পরিবেশ সৃষ্টি করে। আবার আরেকটি বিষয় লক্ষ করলে দেখবেন এদের বয়সও সাধারণত খুব বেশি হয় না। এর মূল কারণ হচ্ছে বয়ঃসন্ধিকালে (puberty) আর সব মানুষের মতো এদের যৌনাকাঙ্খা আর দশটা মানুষের মতো গড়ে উঠে না। তাই আর সবার মতো স্বাভাবিক যৌন আচরণও এরা করে না। তবে ফিরে আসা যাক এ ধররে আচরণের ব্যাখ্যায় ধর্ষণ ও শিশু নির্যাতন থেকে শুরু করে নারী নির্যাতন পর্যন্ত শুধুমাত্র নিজের কর্তৃত্ব (domain) প্রতিষ্ঠার জন্যই করা হয়। এ ধরনের পুরুষেরা সাধারণত শিশুকালে ভয়াবহ যৌন, শারীরিক, মানসিক বা পরিবেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। তাই তারা নিজেদেরকে নিয়ে অনেক হীনমন্যতায় ভোগে তবে সেটা সম্পূর্ণ অবচেতনভাবেতাই। একমাত্র যে উপায়ে তারা নিজেদের এই হীনমন্যতা কাটিয়ে উঠতে পারে, তা হচ্ছে অন্য কোনো মানুষকে নির্যাতন (violence) করা। তবে মনোবিদরা বারবার এই মতবাদ ব্যক্ত করেন যে, অনেকগুলো কারণের মধ্যে এটি একটি অন্যতম কারণ। অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে সামাজিক (social),

জেনেটিক্যাল (genetical), জৈবিক (biological), এমনকি পুষ্টিগত (nutritional) ইত্যাদি কারণ। দন্ডবিধির ৩৭৫ ধারায় ধর্ষণকে যেভাবে সয়জ্ঞায়িত করা হয়েছে তা হল-

- কোনো নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা
- কোনো নারীর সম্মতি ছাড়া অথবা
- কোনো নারীকে মৃত্যু বা শারীরিক আঘাতের ভয় দেখিয়ে সম্মতি বাধ্য করলে অথবা
- নাবালিকা অর্থাৎ ১৬ বছরের কম বয়স্ক শিশু সম্মতি দিলে কিংবা না দিলে (সে যদি নিজ স্ত্রীও হয়) অথবা
- কোনো নারীকে বিয়ে না করেই ব্যক্তিটি তার আইনসঙ্গত স্বামী এই বিশ্বাস দিয়ে যদি কোনো পুরুষ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে আইনের ভাষায় ধর্ষণ বলে।

*তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ দন্ডবিধি ধারা - ৩৭৫*

**যৌন নিপীড়ন**

নারী পুরুষ নির্বিশেষে যে কোনো বয়সের মানুষই যৌন নিপীড়নের শিকার হতে পারে। বেশিরভাগ সময়ে নারী ও শিশুরাই এই শিকার হয়ে থাকে। আমাদের জানতে হবে, যৌন নিপীড়ন বলতে আমরা কি বুঝি।

কোনো ব্যক্তি কারো দেহকে যখন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা প্রলোভনের দ্বারা নিজের যৌন বাসনা মেটানোর জন্য ব্যবহার করে, তখন সেটাকে বলা হয়ে থাকে যৌন নিপীড়ন। নারী পুরুষ যে কেহ যে কোনো সময় যৌন নিপীড়নের শিকার হতে পারে। তবে শিশু, কম বয়সী ছেলে বা মেয়ে এই অবস্থার মুখোমুখি বেশি হয়। সাধারণত যৌন নিপীড়নকারীরা শিশু বা কম বয়সী ছেলে মেয়েদের ভয়, প্রলোভন, হুমকি দিয়ে এই ঘটনা কাউকে জানাতে নিষেধ করে। অনেক সময় যৌন নিপীড়নের শিকার হয়ে অনেক ছেলে মেয়ে মানসিকভাবে কষ্ট পায়, আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে এবং স্বাভাবিক হতে পারে না।

**যৌন নিপীড়ন কতভাবে হতে পারে-**

বিভিন্নভাবে একজন মানুষ যৌন নিপীড়নের শিকার হতে পারে। যেমন-
ক. শারীরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা জোর করে
খ. লোভ দেখিয়ে বা কোনো ফাঁদে ফেলে অথবা দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে
গ. কারো সরলতা বা অসচেতনতার সুযোগ নিয়ে
ঘ. সঙ্গীকে আপত্তিকর নামে ডাকা

**যৌন হয়রানি থেকে নিজেদের রক্ষা করা**

প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ শ্রেণি, বর্ণ, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সর্বত্রই নারীরা আজও নানমূখী নির্যাতনের শিকার। নারী নির্যাতন নারীর জীবনে সর্বগ্রাসী নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দেয় এবং তার সৃজনশীলতা ও গতিশীলতার ক্ষেত্রে মূল বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শুধু তাই নয় এর ফলে নারীরা দক্ষ মানব সম্পদ হয়ে উঠে সামাজিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদন রাখতে পারে না। এর পরিণতিতে সভ্যতা তাই নারীর বহুমাত্রিক অবদান থেকে বঞ্চিত হয়। টেকসই মানব উন্নয়নও তাই হয়ে পড়ে সুদূরপরাহত। আর প্রতিটি নারী নির্যাতনের মারাত্মক নেতিবাচক অভিঘাত কেবল ঐ ব্যক্তিনারী বা তার পরিবারের মধ্যেই সীমিত থাকে না, তা সমাজকেও নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে। এই সামগ্রিক উপলব্ধি থেকে তাই আজ আমাদের সকলেই নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। শুধু কোন কর্তৃপক্ষের কাঁধে নারী নির্যাতন মোকাবেলার দায় চাপিয়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না, আমাদের সকলেই এক্ষেত্রে তৎপর হতে হবে। বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের যে ক্রমবর্ধমান ভয়াবহতা, তার কাছে আর প্রতিরোধহীন অসহায় আত্মসমর্পণ নয়। আসুন আমরা সবাই এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই। কেননা আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধে নারী নির্যাতন একদিন ঠিকই বন্ধ হবে।

তবে একথাও সত্য যে, নারী নির্যাতনের ভয়াবহতা দ্রুত বৃদ্ধির পাশাপাশি এর বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতাও ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। ঘরে বা বাইরে যেখানেই নারী ও মেয়েশিশু নির্যাতন ঘটুক না কেন, সেটা যে মানবাধিকার ইস্যু তা আজ ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হচ্ছে। রাষ্ট্র বা ব্যক্তির যার দ্বারাই নারী নির্যাতন হোক না

কেন, তা প্রতিরোধসহ অপরাধীদের বিচার এবং নির্যাতিতা নারীকে নিরাপত্তা প্রদান করাটা যে রাষ্ট্রের দায়িত্ব, সেটাও এখন স্বীকৃতি লাভ করেছে। নানা ধরণের নারী নির্যাতন যা মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা উপভোগ থেকে মেয়েদেরকে বঞ্চিত করে, সে সব ব্যাপারেও বৈশ্বিক ও জাতীয় স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন আইন, নীতিমালা ও কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশের পক্ষ থেকে। সকল ধরণের নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপনের ক্ষেত্রেও ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচারণা জোরদার করা ও নির্যাতিত নারীদের সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে এনজিও, নারী সংগঠন তথা সুশীল সমাজ আজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। নারীর প্রতি নির্যাতনমূলক কুপ্রথাগুলিকেও অনেক রাষ্ট্র অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করে তা আইনগতভাবে বিলোপ করেছে।

তবুও সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ কিন্তু এসব অগ্রগতি সত্ত্বেও নারীরা এখনো অব্যাহতভাবে নানাধরণের সহিংসতার শিকার হচ্ছে। নারী ও মেয়েশিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার মূল কারণ অনুধাবনের ঘাটতি নারী নির্যাতন রোধের প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্থ করছে। নারী নির্যাতন করা থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করার মতো প্রয়োজনীয় কর্মসূচির এখনো ঘাটতি রয়ে গেছে। নারী নির্যাতন সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবের ফলে আবার প্রকৃত বাস্তবতা জেনে-বুঝে নীতি নির্ধারণ এবং পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করাটা দুরূহ হয়ে পড়ে। বৈষম্যমূলক আর্থ-সামাজিক মনোভাব এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য সমাজে নারীদের অধঃস্তন অবস্থানকে আরো পাকাপোক্ত করে। এর ফলে নারী ও মেয়েশিশুরা নানা ধরণের নির্যাতনের শিকার হয়। এসব নির্যাতনের মধ্যে রয়েছে দৈহিক নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন এবং মনস্তাত্বিক নির্যাতন। এছাড়াও নারী ও মেয়েশিশুদের ভাগ্যে জোটে প্রহার, পারিবারিক পরিমন্ডলে নির্যাতন, যৌতুক সংক্রান্ত নির্যাতন, স্ত্রী ধর্ষণ, স্ত্রী খৎনা, মেয়েদের জন্য ক্ষতিকর অন্যান্য প্রথা ও কুসংস্কার, দাম্পত্য সম্পর্ক বহির্ভূত নির্যাতন এবং শোষণজনিত নির্যাতন। অনেক দেশেই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, কর্মক্ষেত্র , প্রচার মাধ্যম, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত করে নারী নির্যাতন প্রতিরোধের একটি সমন্বিত বহুমুখী অ্যাপ্রোচ এখনো নেই বললেই চলে। বৈবাহিক জীবনে যৌন নির্যাতনসহ পারিবারিক নির্যাতনকে অনেক দেশে এখনো ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পারিবারিক নির্যাতনের প্রতিফল সম্বন্ধে সচেতনতা, কিভাবে তা প্রতিরোধ করা যায়, নির্যাতিতের অধিকার- এসব ব্যাপারে এখনো সচেতনতার যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও পারিবারিক নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরণের নারী ও মেয়েশিশু নির্যাতন এবং শিশু পর্ণোগ্রাফির বিরুদ্ধে আইন ও আইনগত ব্যবস্থা-বিশেষত অপরাধীদের বিচার-এসব এখনো অনেক দুর্বল। নারী নির্যাতন প্রতিরোধের কৌশলগুলিও খন্ডিত এবং প্রতিক্রিয়াধর্মী এবং এসব ইস্যুতে প্রয়োজনীয় কর্মসূচিরও প্রচন্ড অভাব রয়েছে। উল্লেখ্য যে, কিছু কিছু দেশে নারী ও শিশু পাচারের ক্ষেত্রে এবং সকল ধরণের যৌন ও অর্থনৈতিক শোষণের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার আরো নতুন করে সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

### কোন কোন স্থানে এই সেবাসমূহ পাওয়া যায়

কিশোর কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ও বিকাশ সঠিকভাবে সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের অধীনে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর আওতাধীন সেবা কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কৈশর বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কর্নার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যেখানে কিশোর-কিশোরী স্বচ্ছন্দে এবং নিঃসংকোচে তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শে সেবাগুলি গ্রহণ করতে পারবে। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনা য়ের অধীনে সারা দেশে পরিবার পরিকল্পনা সেবাসহ মা,শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের সেবা প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পুষ্টিসেবা দিয়ে আসছে। এমসিএইচ সার্ভিসেস অথাৎ ম্যাটারনাল এন্ড চাইল্ড হেলথ সার্ভিসেস ইউনিট পরিবার পরিকল্পনার একটি ইউনিট। সারাদেশে পরিবার পরিকল্পনা অধিতপ্তরে মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সর এমসিএইচ ইউনিট ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ও স্যাটালাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে এমসিএইচ সার্ভিসেস ইউনিট নিম্নে উল্লিখিত সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে-

১. অনুর্ধ পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের গ্রোথ মনিটরিং সহ স্বাস্থ্য সেবা।
২. কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা
৩. গর্ভবতী মায়ের গর্ভকালীন সেবা,প্রসব সেবা, প্রসব পরবর্তি সেবা

৪. জরুরি প্রসুতি সেবা
৫. পরিবার পরিকল্পনা সেবা (জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ও কাউন্সিলিং)
৬. মাসিক নিয়মিতকরন সেবা (এমআর)
৭. গর্ভপাত পরবর্তী সেবা
৮. জরুরী গর্ভনিরোধ বড়ি
৯. প্রসব পরবর্তি অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ প্রতিরোধ ট্যাবলেট মিসোপ্রোসটাল বিতরণ
১০. শিশু, কিশোরী, গর্ভবতী মা ও দুগ্ধদানকারী মায়ের পুষ্টি সেবা।
১১. প্রজননতন্ত্রের প্রদহ ও ইনফেকশন, যৌনবাহিত রোগের চিকিৎসা
১২. সাধারণ রোগীর স্বাস্থ্যসেবা

সেবাগুলো ছাড়াও সারাদেশে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের প্রায় ২৩০০০ মাঠকর্মী অথাৎ পরিবার কল্যাণ সহকারী বা এফডাব্লিউএ রয়েছে যারা বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী (বড়ি কনডম আয়রন-ফলিক এসিড বড়ি পৌঁছে দেয় এবং গর্ভবতী ও প্রসূতি মা, কিশোর-কিশোরী ও বাড়ির সিদ্ধান্ত গ্রহনকারীদের তথ্য দিয়ে সুস্থ জীবনযাপন ও সেবা নিতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

**পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সেবাসমূহ:**

১) জেলা পর্যায়ে মা ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র বা এমসিডাব্লিউসি: এই কেন্দ্রগুলো থেকে দুজন মেডিকেল অফিসারসহ পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা সেবা করে প্রদান থাকে। সিরাজগঞ্জ, ঠাকুরগাঁ, কক্সবাজার, মৌলভীবাজার, পটুয়াখালী, বরগুনা, খাগড়াছড়ি, কিশোরগঞ্জ, ভোলা, জামালপুর, খুলনা, নীলফামারী, এই ১২টি জেলায় মা ও শিশু কল্যানকেন্দ্রে কৈশোর-বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা চালু করা হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলো থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবাপ্রদনিকারীগণ বন্ধুত্বপূর্ণভাবে ১০-১৯ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করে থাকে।

২) উপজেলা পর্যায়ে:

ক) মা ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র বা এমসিডাব্লিউসি- এই কেন্দ্রগুলো থেকে দুজন মেডিকেল অফিসারসহ পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা সেবা করে প্রদান থাকে।

খ) উপজেলা এমসিএইচ ইউনিট- উপজেলা পর্যায়ে অধিকাংশ এমসিএইচ ইউনিট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর ভিতর কয়েকটি কামরা নিয়ে গঠিত। এখানে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন চিকিৎসক, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা সেবা করে প্রদান থাকেন।

৩) ইউনিয়ন পর্যায়ে-ইউনিয়ন স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র- ইউনিয়ন পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে যেগুলোর অধিকাংশই দোতলা। একতলা থেকে সেবা প্রদান করা হয় আর দোতলায় সেবাপ্রদানকারীদের বাসস্থান রয়েছে। এখানে একজন উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার ও একজন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা সেবা করে প্রদান থাকেন। সারা বাংলাদেশে প্রায় ৪৫০০ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলোর মধ্য থেকে ৩৫০০ এর বেশী কেন্দ্রে ২৪/৭ নরমাল ডেলিভারী সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

৪) গ্রাম পর্যায়ে স্যাটেলাইট ক্লিনিক ইউনিয়নে যে ওয়ার্ডে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে সে ওয়ার্ড বাদে অন্য ওয়ার্ডগুলোতে স্যাটেলাইট ক্লিনিক অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের একজন প্রভাবশালী ও জনাপ্রয় ব্যক্তির বাড়ি স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজনের জন্য বাছাই করা হয়। এভাবে একটি ইউনিয়নে ৮টি বাড়ি নির্বাচন করা হয় স্যাটেলাইট ক্লিনিকের জন্য। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে কর্মরত পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা মাসে ৮টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক করেন অর্থাৎ প্রতিটি স্যাটেলাইট ক্লিনিকে মাসে একবার যে যে সেবা প্রদান করেন এতে করে যাদের বাড়ি থেকে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র দূওে তারা সহজেই বাড়ির কাছে স্যাটেলাইট ক্লিনিক থেকে সেবা গ্রহন করতে পারেন।

# পঞ্চম অধ্যায় (Chapter Five)
## প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা
(Basic concepts related to disability)

### প্রতিবন্ধিতা কী

শারীরিক, অঙ্গগত, বুদ্ধি-বৃত্তিক বা আর্থ-সামাজিক সীমাবদ্ধতার কারণে যাদের পরিপূর্ণ বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় এবং স্বাভাবিক জীবন-যাপন ও সুষ্ঠুভাবে সামাজিক ভূমিকা পালনে নানা প্রতিবন্ধকতার শিকার তাদেরকে প্রতিবন্ধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির এই অবস্থাকে প্রতিবন্ধিতা বলা হয়। 'প্রতিবন্ধিতা' ব্যক্তির কোন অসুস্থ্যতা কিংবা রোগ নয়; এটি একটি অবস্থা মাত্র।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এ বলা হয়েছে - "প্রতিবন্ধিতা" অর্থ যে কোন কারণে স্বীয়ভাবে কোন ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্থতা বা প্রতিকূলতা এবং উক্ত ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিবেশগত বাধার পারস্পরিক প্রভাব, যাহার কারণে উক্ত ব্যক্তি সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত হন।

জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ বলা হয়েছে, 'প্রতিবন্ধিতা একটি বিকাশমান ধারণা এবং প্রতিবন্ধিতা হলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিবেশগত বাধার মধ্যকার আত্মসম্পর্কের পরিণতি, যা অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাধাগ্রস্থ করে।

### প্রতিবন্ধিতার শ্রেণী বিন্যাস

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ অনুসারে প্রতিবন্ধিতার শ্রেণী বিন্যাস নিম্নরূপ:

১) অটিজম বা অটিজমস্পেক্ট্রাম ডিজঅর্ডারস
২) শারীরিক প্রতিবন্ধিতা
৩) মানসিক অসুস্থ্যতাজনিত প্রতিবন্ধিতা
৪) দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা
৫) বাকপ্রতিবন্ধিতা
৬) বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা
৭) শ্রবণপ্রতিবন্ধিতা
৮) শ্রবণ - দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা
৯) সেরিব্রাল পালসি
১০) ডাউন সিনড্রোম
১১) বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা
১২) অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা

এছাড়া নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩ নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল অর্থাৎ স্নায়োবিক বিকাশজনিত প্রতিবন্ধিতার ধরনসমূহ:

১) অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারস
২) ডাউন সিনড্রোম
৩) বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা
৪) সেরিব্রাল পালসি

**বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতার বিবরণ**

**অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারস:**

অটিজম মস্তিস্কের স্বাভাবিক বিকাশের এইরুপ একটি জটিল প্রতিবন্ধকতা যাহা শিশুর জন্মের এক বৎসর ছয় মাস হইতে তিন বৎসরের মধ্যে প্রকাশ পায়। এই ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাধারণত শারীরিক গঠনে কোন সমস্যা বা ত্রুটি থাকে না এবং তাদের চেয়ারা ও অবয়র অন্যান্য সুস্থ্য' ও স্বাভাবিক মানুষের মতই হইয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ছবি আঁকা,গান করা, কম্পিউটার চালনা বা গাণিতিক সমাধানসহ অনেক জটিল বিষয়ে এসব ব্যক্তিরা বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া থাকে। এসব প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মধ্যে এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়;

ক) মৌখিক বা অমৌখিক যোগাযোগের সীমাবদ্ধতা;
খ) সামাজিক ও পারস্পরিক আচার-আচরণ, ভাববিনিময় ও কল্পনাযুক্ত কাজ- কর্মের সীমাবদ্ধতা;
গ) সরাসরি চোখের দিকে তাকায় না;
ঘ) অন্য ছেলেমেয়েদের সাথে খেলে না;
ঙ) তোতা পাখির মতো স্বর অনুকরণ করে কথা বলে;
চ) বিশেষ কিছু শব্দের প্রতি ভীতি মোহ প্রদর্শন করে;
ছ) শুধুমাত্র একটি বিষয়ের প্রতি তন্ময়তা দেখায়;
জ) অতিরিক্ত চঞ্চলতা বা উত্তেজনা, অসংগতিপূর্ণ হাসি-কান্না;
ঝ) নির্দিষ্ট কোন নিয়ম বা ছকে বাঁধা কার্যাবলির প্রতি অনড় থাকা;
ঞ) কিছু কিছু অটিস্টিক শিশু আবার খুবই চঞ্চল প্রকৃতির হয়;

**শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি**

যারা খুঁড়িয়ে হাঁটে, লাঠির সাহায্যে চলাফেরা করে, পায়ে ভর দিয়ে বা কিছু না ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না; কিংবা হাত বাঁকা, অপেক্ষাকৃত ছোট, আঙ্গুল নেই, হাত নাড়াতে বা উঠা-নামা করাতে পারে না; দীর্ঘ ক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না; ঘাড় নাড়াতে পারে না, প্রয়োজনে পুরো শরীর ঘুরিয়ে আশেপাশে বা ওপরে দেখতে হয়; কোমরে ব্যথার কারণে বসতে পারে না, বসলেও প্রচণ্ড ব্যথা হয় তারা শারীরিক প্রতিবন্ধী। তাছাড়া, মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত বা সেরিব্রাল পালসি, মাংসপেশীর অপূর্ণ গড়ন, অপরিপক্ক ও ভঙ্গুর, মেরুদণ্ডের অসম গড়ন, কুষ্ঠরোগ, রিকেটস্, ল্যাথারিজম, ফাইলেরিয়া, ক্লেফ্টলিপ ও ক্লেফ্টপ্যালেট, সন্ধি বিচ্যুতি বা ডিসলোকেশন, ক্লাব ফিট, পোলিও, ক্রেটিনিজম, প্যারালাইসিস এ আক্রান্ত ব্যক্তিরা শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি।

**দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি**

যারা এক চোখে কিংবা দুই চোখে দেখে না, চশমা ছাড়া দেখে না কিংবা খালি চোখে ৪ গজের বেশি দেখে না তারা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। তাছাড়া রাতকানা (Night blindness), বর্ণান্ধতা (Color blindness), রঙের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারা, চোখে ছানি পড়া কিংবা দৃষ্টিগত অন্যান্য সীমাবদ্ধতা যেমন, সূর্যের প্রখর আলোতে অসুবিধা, মুখ দেখেও মানুষ চিনতে না পারা ইত্যাদি।

স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পন্ন: ব্যক্তি যদি তার পরিবেশের প্রয়োজনীয় দূর বা নিকট দৃষ্টির কাজগুলি করতে সক্ষম হয় সে স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পন্ন। এক্ষেত্রে তার চশমার প্রয়োজন হতে পারে।

ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন: উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ক্ষীণ দৃষ্টি। তুলনামূলক স্বাভাবিক চোখের দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা <৬/১৮ এর চেয়ে কম এবং দৃষ্টি ক্ষেত্র ২০ ডিগ্রি এর চেয়ে কম। চিকিৎসা বা প্রতিসরণ সমস্যা সমাধানের পরও দৃষ্টি শক্তি স্বাভাবিক নয়।

**সম্পূর্ণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী:**

যার চোখে কিছু দেখেন না এমন কি কারও কারও ক্ষেত্রে চোখে কোন আলোক অনুভূতি নেই তারা সম্পূর্ণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি WHO এর মতে, তুলনামূলক স্বাভাবিক চোখের দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা <৩/৬০ এর চেয়ে কম এবং দৃষ্টি ক্ষেত্র ১০ ডিগ্রি এর চেয়ে কম।

**বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি**

ক. শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা: কানের এক বা একাধিক অংশের ক্ষতিগ্রস্থতা যার ফলে অনেকেই স্বাভাবিকের তুলনায় কম শুনতে পায় বা একেবারেই শুনতে পায় না। অন্য ভাবে বলা যায় যে কোন কারণে কানের কোন অংশের ক্ষতিগ্রস্থতার কারণে কোন ব্যক্তি বা শিশু স্বাভাবিক শ্রবণ ক্ষমতা হ্রাস হলে ব্যক্তি বা শিশুর এই অবস্থাকে শ্রবণ প্রতিবন্ধী বলা হয়। সাধারণত যারা ৪-৭ মিটার (১২-২০ ফুট) -এর মধ্যে বলা স্বাভাবিক স্বরের কথা বা শব্দ শুনতে বা বুঝতে পারে না, তারা শ্রবণ প্রতিবন্ধী। স্পষ্ট শোনার জন্য কেউ যদি কানে শুনতে সহায়ক যন্ত্র (Hearing Aid) ব্যবহার করলে তাকে শ্রবণ প্রতিবন্ধী বলা হয়।

খ.বাক্ প্রতিবন্ধিতা: যারা কথা বলতে পারে না বা কথা বলার সময় তোতলাতে থাকে বা যাদের কথা বুঝা যায় না বা অস্বাভাবিক স্বরে কথা বলে, কিংবা কথা ওলট-পালট করে বলে তাদের বাক্ প্রতিবন্ধী হিসেবে চিহ্নিত করুন। এমন অনেকেই আছে যারা খুবই নিচু স্বরে কথা বলে, চেষ্টা করেও উচ্চস্বরে কথা বলতে পারে না, তারাও বাক্ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি।

**বি. দ্র.** শিশু জন্মের পর থেকে কানে শুনতে না পেলে সে কথা বলতে ও শিখতে পারে না। তাই শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুরা বাক্ প্রতিবন্ধীও হয়ে থাকে। এ কারণে সাধারণত বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধিতাকে একসাথে উল্লেখ করা হয়)

**বুদ্ধি প্রতিবন্ধী**

যারা তাদের সমবয়সী অন্যান্য ছেলেমেয়েদের তুলনায় বুদ্ধি বা মানসিক বিকাশের দিক দিয়ে অপরিণত/অপরিপক্ক; অপেক্ষাকৃত বেশি দেরি করে কথা বলা, দাঁড়ানো, হাঁটা ইত্যাদি শিখে এবং জন্মের পর থেকেই বয়স অনুপাতে বুদ্ধি বিবেচনা বা মানসিক বিকাশ বৃদ্ধি পায় না; জীবনের ক্রম ধাপে যারা সব কিছু বুঝতে বা শিখতে বেশি সময় নেয় বা কোন কোন বিষয় একেবারেই শিখতে পারে না; এদের কেউ কেউ চুপচাপ এক জায়গায় বসে থাকে, কেউ কেউ একা একা কথা বলতে থাকে; কোন বিষয়ে এরা বেশিক্ষণ মনোযোগ হয়তোবা দিতে পারে না, তারাই বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। এদের মাথার গঠন অস্বাভাবিক (কখনও মঙ্গোলীয় ধরনের) এবং কারও কারও দেহের গঠনও অস্বাভাবিক যেমন, অতিরিক্ত মোটা হতে পারে। বুদ্ধির মাত্রা (আই. কিউ.) অনুসারে তাদের বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতার মাত্রা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে (যা এখানে করা হচ্ছে না)। গভীর বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের মুখ দিয়ে সব সময় লালা ঝরতে) দেখা যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হাত-পা বা দেহের ভারসাম্য থাকে না। এটি একটি অবস্থা যার কারণে কিছু ব্যক্তি খুব ধীরে ধীরে শিখে অথবা কিছু কিছু বিষয় শিখতেই পারে না। বুদ্ধিমত্তার স্তর সাধারণভাবে কম হওয়ার কারণে তাদের শেখার গতি অন্যান্য সম বয়সীদের তুলনায় ধীর। বন্ধুদের সাথে, পরিবারে বা সামাজিক পরিবেশে কীভাবে আচরণ করতে হয়, তা বোঝা বা মনে রাখাও তাদের জন্য কষ্টকর। আমাদের সমাজে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বর্ণনা করার সময় নানারকম ব্যঙ্গাত্বক শব্দ ব্যবহার করা হয়, যেমন- নির্বোধ, হাবাগোবা, পাগল ইত্যাদি। কিন্তু এই শব্দগুলো খুবই অপমানজনক। "বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি" শব্দটি ব্যবহার করাই সবচাইতে ভাল। বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা ও মানসিক অসুস্থতা এক নয় বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতার অর্থ হচ্ছে বুদ্ধির মাত্রা বয়সের তুলনায় কম; যার কারণে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বয়স বাড়লেও বুদ্ধিগত দিক দিয়ে শিশুদের মতো। কোন প্রকার চিকিৎসা দিয়ে বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা দূর করা যায় না; কিন্তু মানসিক অসুস্থতা উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমের সম্পূর্ণ বা অনেকাংশে সুস্থ করে তোলা সম্ভব।

মানসিক অসুস্থতা: আচার-আচরণে অস্বাভাবিক অস্থিরতা, অহেতুক হাসা বা কাঁদা বা একা একা কথা বলা, অসামঞ্জস্য কাজকর্ম করা (বৎসরের বিশেষ বিশেষ সময়ে এই অসামঞ্জস্য দেখা দিতে পারে), জিনিসপত্র নষ্ট করা, কাউকে আক্রমণ করা, অহেতুক রেগে যাওয়া, অকথ্য ভাষা ব্যবহার করে গালি-গালাজ করা, হিংস্র হয়ে উঠা ইত্যাদি যারা করে থাকে, তারা মানসিক অসুস্থতা। কেউ কেউ কোন কিছুই সঠিকভাবে বুঝে না, কয়েক বার বললেও কোন জবাব দেয় না, দিলেও প্রশ্ন অনুযায়ী নয়। বা কেউ কেউ স্থান-কাল-পাত্রভেদ বুঝে না, না বুঝেই যা ইচ্ছে তাই করে। সাধারণত যাদের পাগল বলা হয়ে থাকে, তারা আসলে মানসিকভাবে অসুস্থতা।

### সেরিব্রাল পল্সি

সেরিব্রাল পালসি বা মস্তিষ্ক পক্ষাঘাত হল মস্তিষ্কে আঘাত বা ক্ষতিজনিত প্রতিবন্ধিতা। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে, সময় বা পরে তিন বছর বয়সের মধ্যে মস্তিষ্কের কোন অংশে আঘাত বা ক্ষতি হওয়ার ফলে সেরিব্রাল পালসি হয়। এতে শরীরের মাংসপেশির কার্যক্রম, নড়াচড়া ও ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়ে থাকে। সেরিব্রাল পালসি হল সবচেয়ে জটিল স্নায়বিক প্রতিবন্ধিতাগুলোর একটি; যা সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী অনেক ভুল ধারণা রয়েছে। একেক সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিবন্ধিতার মাত্রা ও প্রকৃতি একেক রকম হয়ে থাকে। মস্তিস্কের ক্ষতস্থান অনুযায়ী সেরিব্রাল পালসিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়:

ক) স্প্যাসটিক: ক্ষতস্থান মোটর কর্টেক্স এরিয়া
খ) অ্যাথিয়েড: ক্ষতস্থান মস্তিস্কের মধ্যভাগে অবস্থিত ব্যাসাল গ্যাংগলিয়া।
গ) অ্যাটাক্রিয়া: ক্ষতস্থান সেরিবেলাম অঞ্চল।

এছাড়াও আরো তিন ধরনের দেখা যায়
ক) ফ্লোপি
খ) বহুবিধ: বহুবিধ প্রতিবন্ধিতা বলতে স্প্যাসটিক এর সাথে শ্রবণ প্রতিবিন্ধতা, বাক প্রতিবন্ধিতা, দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা
গ) মিশ্র: অ্যাথিটয়েড, ফ্লোপি দুটি ধরণের সেরিব্রাল পালসি এক সঙ্গে থাকলে।

সেরিব্রাল পালসিতে আক্রান্ত শিশু তাৎক্ষণিক বা হঠাৎ অনমনীয় হয়, শিথিলতা অর্থাৎ হাতের উপরে শিশুকে উপুড় করে ধরলে এবং পা নিচের দিকে ঝুলে এবং সে মাথা নিজে নিজে ওঠাতে পারবেনা। শিশু খুব কম নড়াচড়া করবে। বিলম্বিত বা ধীর বিকাশ ঘটে। খাওয়া - দাওয়ায় সমস্যা বা খাবার অনিহা থাকে কারণ চুষতে, চিবুতে এবং গিলতে অসুবিধা হয়। অস্বাভাবিক আচরণ যেমন শিশু সব সময় কাঁদতে পারে, খিটখিটে মেজাজের হতে পারে। সেরিব্রাল পালসিতে আক্রান্ত অনেক শিশুই সাধারণ শিশুদের মত, আবার অনেক সময় তার চেয়েও ভালভাবে সব কিছু শিখতে পারে। অনেকে পড়াশুনায় এত ভাল করে যে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যেতে পারে। উপযুক্ত পরিবেশ পেলে সেরিব্রাল পালসি জনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিয়ে ও পরিবার গঠন করতে পারে।

### ডাউন সিনড্রোম

ডাউন সিনড্রোম হল মানবদেহের দেহ কোষের জ্বীনের এক ধরণের জন্মগত গঠনগত ত্রুটি, যখন দেহ কোষের ২১ নম্বর ক্রোমোজমে স্বাভাবিক ২টির চেয়ে ১টি বেশী ক্রোমোজোম দেখা যায়। এটি বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতার অন্যতম ধরণ। বাবা বা মায়ের যে কোন একজনের কোষের ক্রোমোজম বিভাজনের ত্রুটির ফলেই শিশু ডাউন সিড্রোমে আক্রান্ত হয়। ডাউন সিনড্রোম বাবা মায়ের কোন (খারাপ) কর্মের ফল হিসেবে ভাবা অবান্তর বা অবাস্তব। চল্লিশোর্ধ বয়সে কোন মা সন্তান ধারণ করলে ডাউন সিনড্রোমে শিশু জন্ম নেয়ার সম্ভাবনা বহুগুণে বেড়ে যায়, বিশেষ করে তা যদি প্রথম সন্তান হয়। অতি বৃদ্ধ বাবার ক্ষেত্রেও এটি ঘটতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে বলা হয় যে, বাবা ও মায়ের মিলিত বয়স যদি আশির উপরে হয়, সেক্ষেত্রেও তাদের সন্তান ডাউন সিনড্রোমসহ জন্ম নিতে পারে। ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত শিশুদের দেখতে চীনা, জাপানী বা কোরীয় শিশুদের মত দেখায়। ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত ব্যক্তিদের হাত ও পা দেহের তুলনায় ছোট, নাক ও মুখগহবর ও ছোট, চোখের উপরের পাতা নামানো (ঢালু) এবং মুখমন্ডল চ্যাপ্টা/ গোল ও ঘাড় খাটো হতে পারে। এদের মুখ হা এবং জিহবার কিছু অংশ বের হয়ে থাকে। কারো কারো লালা ঝরে। ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত ব্যক্তিদের হাতের তালুর উপরের অংশে লম্বা দাগ থাকে। ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত ব্যক্তিদের শিখতে সমস্যা হয়। এদের সমবয়সীদের তুলনায় ছোট বলে মনে হতে পারে। বেশীর ভাগ ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত শিশু ১বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত বসতে ও ২বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত হাঁটতে পারেনা। মেয়ে শিশুদের তুলনায় ছেলে শিশুদের উন্নয়ন বা বিকাশের ধারায় কিছুটা পিছিয়ে থাকে। যেমন - গড়ে যেখানে মেয়ে শিশুরা ২২ মাসে হাটে, সেখানে ছেলে শিশুরা ২৬ মাসে হাঁটতে শিখে। ডাউন সিনড্রোম কোন রোগ বা অসুস্থতা নয় তাই ডাউন সিনড্রোম নিরাময় যোগ্য নয়।

**প্রতিবন্ধিতার মাত্রা**

প্রতিবন্ধিতার মাত্রা বলতে বুঝায় ব্যক্তির প্রতিবন্ধিতা কোন পর্যায়ে রয়েছে, এর গভীরতা বা পরিমাণ কতটুকু। এর কোন আদর্শ সীমারেখা বা মান না থাকলেও প্রতিবন্ধিতার কারণে ব্যক্তির অবস্থা বুঝতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রতিবন্ধিতার মাত্রা বা গভীরতাকে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে:

**১. মৃদু প্রতিবন্ধিতা:** এ ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সাধারণ ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে, স্বাভাবিক মানুষের মতো প্রায় সব ধরনের কাজ করতে না পারলেও বিশেষ কোন কাজে দক্ষতা অর্জন করতে পারে বা তার দক্ষতার উন্নয়ন অপেক্ষাকৃত সহজ। তারা প্রতিবন্ধিতা সত্ত্বেও দৈনন্দিন জীবন যাপনে তুলনামূলকভাবে স্বনির্ভর। যে সকল দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সামান্য হলেও দুই চোখে দেখেন; শ্রবণ প্রতিবন্ধী হলেও দুই কানে শোনেন- এ রকম অবস্থায় তাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনে কোন সহায়কের প্রয়োজন না হলে অর্থাৎ নিজেদের সমস্যা থাকা সত্ত্বেও স্বনির্ভর জীবন যাপন করতে সক্ষম তাদের প্রতিবন্ধিতার মাত্রা মৃদু মাত্রার।

বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বেশির ভাগই মৃদু মাত্রার মধ্যে পড়ে। তারা নিজের যত্ন নেয়া এবং জীবন যাপনের দক্ষতা শিখতে পারে; সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারে; কারো তত্ত্বধানে যে কোন সহজ কাজ করতে পারে এবং পড়াশুনার ক্ষেত্রে প্রায় ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

**২. মাঝারি প্রতিবন্ধিতা:** প্রতিবন্ধিতার কারণে বিশেষ বিশেষ কাজ সম্পাদন করতে পারে না এবং দৈনন্দিন জীবন যাপনে আংশিকভাবে সহায়তাকারীর উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ এরা খাওয়া-দাওয়া, ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যের উপর আংশিকভাবে নির্ভর করে থাকে, যেমন-গোসল করিয়ে দেয়া, টয়লেটে যেতে সাহায্য করা, জামা পরা ইত্যাদি। এরা সব ধরনের কাজ করতে সক্ষম না হলেও কোন কোন কাজে দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

যে সকল দৃষ্টি প্রতিবন্ধী কোন এক চোখে একবারেই দেখতে পারেন না; শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কোন কানে কিছুই শোনতে পায় না, তারা অনেকটা স্বনির্ভর ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করলেও তাদের প্রতিবন্ধিতা মাঝারি ধরনের। আবার কোন ব্যক্তি দুই চোখে সামান্য হলেও দেখেন; শ্রবণ প্রতিবন্ধী হলেও দুই কানে শোনে- এ রকম অবস্থায় তাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনে কোন কোন ক্ষেত্রে সহায়কের প্রয়োজন হলে অর্থাৎ নিজেদের প্রতিবন্ধিতার কারণে স্বনির্ভর জীবন যাপন করতে সক্ষম নন- তাদের প্রতিবন্ধিতার মাত্রা মাঝারি।

মাঝারি মাত্রার বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুরা শুরুতে জামা কাপড় পড়া, নিজের হাতে খাওয়া এবং শৌচাগার ব্যবহার শেখায় সমস্যা হয় এবং বেশ সময় লাগে; কারও তত্ত্বাবধানে সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মকান্ডে অংশ নিতে পারে; প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সহজ বৃত্তিমূলক কাজ করতে পারে; পড়াশুনার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

**৩. গুরুতর প্রতিবন্ধিতা:** এক বা একাধিক প্রতিবন্ধিতার কারণে দৈনন্দিন জীবন যাপনে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর উপর নির্ভরশীল। ধৈর্য্য সহকারে আন্তরিকতার সাথে দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের খাওয়া-দাওয়া, ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সহ ছোট-খাট, সহজ কাজ শেখানো যায়। যে সকল দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দুই চোখেই দেখতে পারেন না কিন্তু আলো-আধার বুঝতে পারেন; শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দুই কানেই শোনতে পান না; কিন্তু তীক্ষ্ণ শব্দ যেমন, বজ্রপাতের শব্দ শোনতে পান - তাদের প্রতিবন্ধিতা গুরুতর ধরনের।

গুরুতর মাত্রার বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যে কোন সহজ কাজ শিখতে সময় এবং প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন হয়; প্রাত্যহিক জীবন যাপনে বেশ সহযোগিতার প্রয়োজন হয়; কথা বুঝায় ও মনোযোগ দেয়ায় সমস্যা থাকতে পারে; প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অতি সাধারণ ও সহজ নির্দিষ্ট কিছু কাজ করতে পারে।

**৪. গভীর/চরম প্রতিবন্ধিতা:** সাধারণত সার্বক্ষণিকভাবে সহায়তাকারীর উপর নির্ভরশীল। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও একাধিক প্রতিবন্ধিতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের কেউ কেউ গভীর প্রতিবন্ধী হতে পারে। এই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কোন কিছু করতে পারে না - খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পর্যন্ত অন্যকে করিয়ে দিতে হয় তারাই গভীর প্রতিবন্ধী। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যারা দুই চোখেই দেখতে পারেন না ও চোখে কোন আলোক সংবেদন নেই; শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দুই কানে একেবারেই শোনতে পান না- তাদের প্রতিবন্ধিতা গভীর ধরনের। খুব কম সংখ্যক বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি গভীর/চরম মাত্রার মধ্যে পড়ে। তাদের

প্রাত্যহিক জীবন যাপনে ধারাবাহিক সহযোগিতা ও নিবিড় তত্ত্বাবধান ও বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয়। সাধারণত তাদের কিছু স্বাস্থ্য জটিলতা থাকে, যেমন- হৃদরোগ, শ্বাস-প্রশ্বাসে অসুবিধা বা রক্তশূন্যতা।

**প্রতিবন্ধিতার কারণ:** মানুষ প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণগুলো তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়: ক) শিশু জন্মের পূর্বে বা গর্ভাবস্থায় প্রতিবন্ধিতার কারণসমূহ, খ) প্রসবকালীণ প্রতিবন্ধিতার কারণসমূহ এবং গ) জন্মের পরে প্রতিবন্ধিতার কারণসমূহ।

**ক. শিশু জন্মের পূর্বে বা গর্ভাবস্থায় প্রতিবন্ধিতার কারণসমূহ**

- গর্ভবতী মায়ের ভুল চিকিৎসা, ভুল ওষুধ বা কড়া ওষুধ যেমন, ট্রেপটো মাইসিন, কুইনাইন সেবন করলে গর্ভস্থ শিশু শ্রবণ, দৃষ্টি, শারীরিক বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হতে পারে।
- গর্ভাবস্থায় মা পরিমিত পুষ্টিকর খাবার না পেলে তার শরীরে আয়োডিন, ভিটামিন বা ক্যালসিয়ামের অভাব দেখা দিতে পারে। আয়োডিন-এর অভাবে শিশু বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বা অন্যান্য জটিলতা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করতে পারে। ভিটামিন 'এ' এর অভাবে রাতকানা এবং অন্ধত্ব হতে পারে। ক্যালসিয়াম এর অভাবে শিশুর হাড় দুর্বল হতে পারে।
- গর্ভাবস্থায় মা মাদক, ধুমপান বা তামাক জাতীয় দ্রব্যে আসক্ত হলে শিশু প্রতিবন্ধী হতে পারে।
- গর্ভাবস্থায় মায়ের রুবেলা, হাম, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ প্রভৃতি হলে গর্ভস্থ শিশু প্রতিবন্ধী হতে পারে।
- গর্ভাবস্থায় যদি গর্ভপাতের ব্যর্থ চেষ্টা করা হয় তাহলেও শিশু প্রতিবন্ধী হয়ে জন্মাতে পারে।
- মা যদি ১৮ বছরের নিচে বা ৩৫ বছরের পর গর্ভবতী হয় তাহলে শিশু প্রতিবন্ধী হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে।
- যৌন রোগগুলোও প্রতিবন্ধিতার জন্য দায়ী। যেমন, মায়ের সিফিলিস থাকলে শিশু দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হতে পারে।
- স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে যদি রক্তের সম্পর্ক থাকে বিশেষ করে তাদের মধ্যে যদি আপন চাচাত, মামাত, খালত প্রভৃতি ভাইবোনের সম্পর্ক থাকে বা রক্তে যদি ঐ জটিলতা থাকে, তাহলেও শিশু প্রতিবন্ধী হতে পারে। বিশেষত বাবার দিকের ভাইবোন (first cousin) অর্থাৎ চাচাতো ভাইবোন এর ক্ষেত্রে শিশুর প্রতিবন্ধী হওয়ার হার সবচেয়ে বেশি।
- গর্ভবতী মা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হলেও শিশু প্রতিবন্ধী হতে পারে।
- গর্ভাবস্থায় মায়ের যদি কোন প্রকার দুর্ঘটনা ঘটে, যেমন পিছলে পড়ে যাওয়া, আঘাত পাওয়া।
- পারমাণবিক দুর্ঘটনা (রাসায়নিক তেজস্ক্রিয়তা বা বিষক্রিয়া) কবলিত এলাকার মায়ের গর্ভস্থ সন্তান প্রতিবন্ধী হতে পারে।

**খ. প্রসবকালীণ প্রতিবন্ধিতার কারণসমূহ**

- শিশু যদি প্রসবকাল (সাধারণত ৯ মাস ১০ দিন) পূর্ণ হওয়ার আগে; যেমন, ৬ বা ৭ মাসে জন্মগ্রহণ করে তাহলে শিশু প্রতিবন্ধী হতে পারে। এসব সাধারণত শিশুর ওজন খুব কম থাকে।
- প্রসব বেদনা যদি খুব দীর্ঘ হয় সে ক্ষেত্রে অক্সিজেনের অভাবে শিশুর প্রতিবন্ধী হওয়ার ঝুঁকি থাকে।
- ফরসেপ ডেলিভারির সময় মাথায় আঘাত লাগার কারণে শিশু প্রতিবন্ধী হতে পারে। যেমন, সেরিব্রাল পালসি।
- শিশু মায়ের গর্ভে অস্বাভাবিক অবস'ানে থাকলে বা শিশুর গলায় যদি নাড়ি পেঁচিয়ে থাকলে শিশু প্রতিবন্ধী হতে পারে।
- ধাত্রী যদি অদক্ষ হয় তাহলে তার দ্বারা সৃষ্ট যে কোন সমস্যার জন্য শিশু প্রতিবন্ধী হতে পারে।
- কয়েকটি রোগ যেমন, জন্ডিস্, ধনুষ্টংকার, নিউমোনিয়া এর কারণে উচ্চতাপমাত্রার জ্বরে শিশু প্রতিবন্ধী হতে পারে।
- গর্ভবতী নারীদের মধ্যে পুষ্টিহীনতার দরুন কম ওজন নিয়ে শিশু জন্মের হার ৪৩ শতাংশ এবং স্থান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থাভেদে গর্ভবতী নারীদের রক্তস্বল্পতার পরিমাণ ৬০-৮০ শতাংশ (জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০০৮)।
- লিঙ্গ বৈষম্য খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় নতুন মাত্রা যোগ করে।

গ. **জন্মের পরে প্রতিবন্ধিতার কারণসমূহ**

- জন্মের পর শিশুর অপুষ্টি প্রতিবন্ধী হওয়ার অন্যতম কারণ। আয়োডিন এর অভাবে শিশু বুদ্ধি, শ্রবণ ও বাক্ প্রতিবন্ধী কিংবা বামন হতে পারে। ভিটামিন 'এ'-র অভাবে রাতকানা ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা হতে পারে। ভিটামিন 'ডি' কিংংবা ক্যালসিয়ামের অভাবে শিশুর হাড় দুর্বল হতে পারে- এমনকি শিশু রিকেটস্-এ আক্রান্ত হতে পারে।
- কিছু কিছু রোগ যেমন: পোলিও, ডায়াবেটিস, কুষ্ঠ এর কারণে কেউ শারীরিক প্রতিবন্ধী হতে পারে। হাম, বসন্ত, গ্লুকোমা, ট্রাকোমা, ডায়াবেটিস প্রভৃতি কারণে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হতে পারে। স্ট্রোক, মৃগী প্রভৃতি থেকে মানসিক অসুস্থতা হতে পারে।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সড়ক দুর্ঘটনা, কেটে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া, গাছ বা ছাদ থেকে পড়ে যাওয়া ইত্যাদি দুর্ঘটনা প্রতিবন্ধী হওয়ার বড় কারণ।
- ভুল চিকিৎসা, ভুল ওষুধ কিংবা অতি উচ্চমাত্রার ওষুধ সেবনের কারণেও কেউ প্রতিবন্ধী হতে পারে।
- কীটনাশক বা অন্যকোন বিষক্রিয়া থেকে পরিবেশ দুষণের ফলে বিভিন্ন অসুখ এবং এর ফলে প্রতিবন্ধিতা সৃষ্টি হতে পারে।
- টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কারণে উচ্চমাত্রার জ্বরের কারণে কেউ প্রতিবন্ধী হতে পারে।
- মস্তিষ্কের আঘাত বা মস্তিষ্কের টিউমারের কারণে শিশু শারীরিক, বুদ্ধি কিংবা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হতে পারে।
- প্রাকৃতিক দুযোর্গ, যুদ্ধ বা সন্ত্রাসও প্রতিবন্ধিতার একটি বড় কারণ।

উল্লিখিত কারণ ছাড়াও প্রতিবন্ধী হওয়ার আরও অনেক কারণ রয়েছে যেগুলো আজও মানুষের অজানা।

**১.৩ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অবস্থা ও অবস্থান:** কোন ব্যক্তির সাধারণ অবস্থা ও অবস্থান বুঝতে হলে তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন সম্পর্কে জানতে হবে। আমরা দেখি, আমাদের দেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বঞ্চিত ও নিগৃহীত। আরও গভীরে দৃষ্টি দিলে দেখি, তারা অন্যদের স্বার্থে পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত, যেখানে তাদের অধিকার, মর্যাদা ও আত্মসন্মান এর মূল্য দেওয়া হয় না! আগে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দয়া দাক্ষিণ্য, করুণার পাত্র ও অক্ষম হিসেবে গণ্য করা হতো। দেখা যায়, প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা, অসচেতনতা ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে প্রধান অন্তরায়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমস্যাটা যতটা না শারিরীক তার চেয়ে বহুগুন বেশি হলো তাদের প্রতি আমাদের নেতিবাচক ও মর্যাদাহানীকর দৃষ্টিভঙ্গীর।

**পরিবারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি**

ব্যক্তি জীবনের বিকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ হচ্ছে পরিবার। সাধারণত দেখা যায়, পরিবারে কোন শিশু প্রতিবন্ধী হয়ে জন্ম নিলে শুরু থেকেই সে চরম অবহেলার শিকার হয়। এমনও দেখা যায়, স্ত্রী প্রতিবন্ধী শিশু জন্ম দেওয়ায় স্বামী তাকে ত্যাগ করে আবার নতুন বিয়ে করে। পরিবারে অন্যদের চেয়ে প্রতিবন্ধী শিশুটি কম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে- ভালো পোশাক, ভালো খাবার, বেড়াতে যাওয়া, খেলাধুলাতে অংশগ্রহণে সবক্ষেত্রে তার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী নেতিবাচক। প্রতিবন্ধী শিশুকে আত্মীয়-স্বজনের সামনে নিয়ে যেতেও কেউ কেউ সংকোচ বোধ করেন, তাই তাদের প্রতিবন্ধী সন্তানকে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখেন। সব সময় প্রতিবন্ধী সন্তানকে দেখা হয় অসুস্থ হিসেবে। তার চিকিৎসায় অনেক অর্থ ও ত্যাগ তিতিক্ষার এক পর্যায়ে চিকিৎসা বন্ধ করে আরও হতাশ হয়ে পড়েন। অথচ তার এই প্রতিবন্ধিতা সম্পন্ন অবস্থা মেনে নিয়েই তার জীবনমান উন্নয়নের ব্যবস্থা করতে হবে -এটি আমাদের অভিভাবকরা মেনে নিতে চান না। পিতামাতা ভবিষ্যত চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয় এবং এক সময় দেখা দেয় প্রতিবন্ধী সন্তানের প্রতি উদাসীনতা। পিতামাতার এই উদাসীনতার কারণেই প্রতিবন্ধী শিশুর জীবনে নেমে আসে হতাশা ও অন্ধকার। 'তোর দ্বারা কিছু হবে না' 'লেখা-পড়া শিখে তুই কী করবি?' 'বাইরে বের হবি না' -এ জাতীয় বাক্যগুলো শুনতে শুনতে এক জন প্রতিবন্ধী শিশু জন্মের শুরু থেকেই নিজেকে মূল্যহীন ও দুর্বল ভাবতে শিখে। পরিবার শিক্ষা থেকে যেমন তাকে বঞ্চিত করে তেমনি মানসিক দৃঢ়তা নিয়ে বেড়ে উঠাকেও নিরুৎসাহিত করে। অথচ পারিবারিক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিবন্ধী শিশুটিকেও আর দশটি শিশুর মতো গড়ে নিতে পারে। অনেক পিতা-মাতা প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েকে

আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে দিয়ে নিজেরা ঝামেলা মুক্ত থাকতে চান; অথচ অন্য স্বাভাবিক শিশুকে চোখের আড়াল করতেও নারাজ!

পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবনধারণ ও বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন, উচ্চবিত্ত পরিবারে প্রতিবন্ধী সন্তানকে বাড়তি সুযোগ-সুবিধা, সেবা ও অতিরিক্ত আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করে এবং অনেক সময় তার জন্য ব্যক্তিগত অতিরিক্ত সম্পত্তি বা টাকা-পয়সা সঞ্চিত রাখার ব্যবস্থা করে থাকে যা তাকে পরিশ্রমী ও আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করে। মধ্যবিত্ত পরিবারে প্রতিবন্ধী সন্তানদের কিছুটা হলেও কর্মক্ষম বা উপার্জনশীল করার চেষ্টা করে, যাতে অভিভাবকদের অবর্তমানে কোনমতে হলেও চলতে পারে। আবার কেউ কেউ প্রতিবন্ধী সন্তানকে লুকিয়ে রাখতেও চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে, আর্থিক অসঙ্গতি ও মধ্যবিত্ত মানসিকতা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবনকে করে তোলে হতাশাগ্রস্ত, সে বিবেচিত হয় পরিবারের বোঝা হিসেবে। আর নিম্নবিত্ত পরিবারে দারিদ্রের কারণে প্রতিবন্ধী সন্তানের পিতা-মাতা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিজেও ঐ প্রতিবন্ধিতাকে কাজে লাগিয়ে ভিক্ষাবৃত্তির সাথে জড়িত করে উপার্জনের একটা পথ তৈরি করে থাকে।

## সমাজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি

পরিবারের পাশাপাশি সামাজিক জীবনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অবস্থান বিবেচনা করলে দেখা যায় সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ অনুপস্থিত; তাদের ভূমিকা দুর্বল ও অস্পষ্ট। প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে এখনও সমাজের মানুষের মনে তেমন ধারণা গড়ে উঠেনি। সমাজে প্রতিবন্ধিতাকে ঘিরে রয়েছে নানা কুসংস্কার। এটাকে শারিরীক বা মানসিক সীমাবদ্ধতা হিসেবে না দেখে বলা হয় খোদার গজব, পাপের ফল, জ্বীনের আছর, বাবা মায়ের পাপের ফল। প্রতিবন্ধী মানুষকে তার নাম ধরে না ডেকে ডাকা হয় ল্যাংড়া, কানা, খোড়া, পাগল, আধপাগল, বোবা, কালা ইত্যাদি বলে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি সমাজের প্রতিটি স্তরে রয়েছে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী। এ দৃষ্টিভঙ্গীটাই মূলত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনে বড় বাধা; সমাজের এখানেই প্রতিবন্ধিতা! প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সুযোগ পেলে সক্ষম হতে পারে-এই শিক্ষাটি আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এখনও গৃহীত হয়নি।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা, চাকরি, ব্যবসায়, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ তেমন চোখে পড়ে না। অনেক অভিভাবক প্রতিবন্ধী সন্তানকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিয়ে গেলেও সামাজিক নানাবিধ উক্তি শোনা এবং হীন নজরে দেখার কারণে প্রতিবন্ধী সন্তানদের নিয়ে যেতে চান না। কুসংস্কারের কারণে যে পরিবারে প্রতিবন্ধী সন্তান আছে সেই পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে অনেকেই অনাগ্রহ প্রকাশ করে। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের লোক-জন পাগল মনে করে; তাদের ক্ষেপাতে খুব মজা পায়।

## সমাজে প্রতিবন্ধী নারী

সমগ্র নারী জাতি যেখানে শোষণের শিকার এবং অধিকার বঞ্চিত সেখানে প্রতিবন্ধী নারীদের অবস্থা তো অবর্ণনীয়! নারী হওয়ায় বৈষম্য ও নির্যাতনের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে তার জীবনক আরও নির্মম ও দুর্বিষহ। প্রতিবন্ধী নারীদেরকে আরও নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে রাখা হয়। অনেক ক্ষেত্র, এক মাত্র মা ছাড়া অন্য কারও সাথে তার যোগাযোগ থাকে না, যেখানে সে একটা বোঝা হিসেবেই পরিগণিত হয়। তারা অনেকেই একাকিত্ব ও বন্ধু-বান্ধবহীন জীবন যাপন করে। অনেক প্রতিবন্ধী নারীর বিয়ের প্রস্তাব আসে না বা বিয়ে হয় না; তার বিয়ে হওয়াটাকে সমস্যা মনে করা হয়। কারও কারও বিয়ে হলেও প্রচুর অর্থ-সম্পদ দিতে হয়। এক্ষেত্রে, পাত্রটি শিক্ষা-দীক্ষায় বা আর্থ-সামাজিক দিয়ে তার উপযুক্ত কিনা তা নাও দেখা হতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী নারীর প্রতিন্ধিতাকেই 'বড় অযোগ্যতা' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিয়ের পর শ্বশুর-শ্বাশুড়ী, দেবর-স্বামী, ননদ-জা ও শ্বশুরবাড়ির অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হয়ে থাকতে হয়; এমনকি কারও কারও জীবনে নির্মম নির্যাতনও নেমে আসে। আবার কোন কোন নারীকে অচিরেই বাবার বাড়িতে ফিরে আসতে হয়। বিয়ের ক্ষেত্রে নারী প্রতিবন্ধীর জন্য পুরুষ প্রতিবন্ধী পাত্র খুঁজে বের করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সমাজের এমনও ধারণা প্রতিফলিত হয় যে, প্রতিবন্ধী নারীরা যৌন জীবনে ও সন্তান ধারণে অক্ষম।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান অনুসারে, দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা দশ ভাগ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী। আর দেশের মোট জনসংখ্যার আশি ভাগ গ্রামে বসবাস করে; সে হিসেবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশাল অংশটিরও বসবাস গ্রামাঞ্চলে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবন মান উন্নয়নে ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কিছু প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম পরিচালনা করলেও এগুলোর অধিকাংশই হচ্ছে শহর কেন্দ্রীক। তাহলে বিষয়টি সহজেই অনুমেয়, দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা দশ ভাগ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে কত জন এর সুফল ভোগ করছে! যদিও সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ইতিমধ্যে জাতীয় নীতিমালা ও প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন-২০০১ প্রণীত হয়েছে। সরকার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদসমূহেও স্বাক্ষর করেছেন। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বনির্ভর সংগঠন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি গণমাধ্যমে প্রচারণা সব মিলিয়ে আজ সমাজে প্রতিবন্ধিতা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বাড়ছে; খুব ধীরে হলেও সামাজিক প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গীর ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষত যে সকল এলাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নিজেরা সংগঠিত হয়ে স্থানীয় জনগণকে সাথে নিয়ে সচেতনতামূলক ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনে কাজ করছে, সে সকল এলাকার ইতিবাচক পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়

- মোট জনসংখ্যার ১০ ভাগ কোন না কোন ধরনের প্রতিবন্ধী অর্থ্যাৎ ৬৫০ মিলিয়ন মানুষ প্রতিবন্ধিতা নিয়ে বসবাস করছে।
- ৩০ ভাগ পরিবারের ভেতরে প্রতিবন্ধী সদস্য রয়েছে।
- উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যার প্রায় ৮০ ভাগ প্রতিবন্ধী
- অনুন্নয়ত দেশে জনসংখ্যার ২০% প্রতিবন্ধী লোকের বসবাস
- আমাদের দেশে ৭০ বছর যাবৎ প্রত্যাশিতভাবে অর্থ্যৎ জনসংখ্যার গড়ে ৮ বছর ধরে অন্যের উপর নির্ভর করে জীবন যাপন করছে।
- এর ফলে প্রতিবন্ধী ও অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যৌন কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছে।
- যার ফল স্বরুপ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে এইচ, আইভি /এইড্‌স ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তিনটি পর্যায় ভাবে ক্ষতির শিকার হচ্ছে শারিরীক এবং যৌনতার অপব্যবহার এবং ধর্ষণ এবং এর ফলে তাদের শারিরীক, মানসিক এবং বিচারসংক্রান্ত উদ্ভাবনী শক্তি সকল সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা প্রায়ই তাদের অভিজ্ঞতা জোর করে নিষ্ফল করে দেয়া হচ্ছে, গর্ভপাতে জোর করা হচ্ছে এবং জোর করে বিয়ে দেয়া হচ্ছে।

আবার জনসংখ্যার ১৫ ভাগ অর্থ্যাৎ ১ বিলিয়ন লোক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাছাকাছি বসবাস করছে। বিপুল সংখ্যক অর্থ্যাৎ শতকরা ৮০ ভাগ প্রতিবন্ধী লোক উন্নয়নশীল দেশেবাস করছে সে সাথে দুই-তুতীয় অংশ প্রতিবন্ধীব্যক্তি এশিয়ার শান্তীপূর্ণ অঞ্চলগুলোতেও রয়েছে। এই সংখ্যক প্রতিবন্ধিতা সৃষ্টি কারন হচ্ছে দ্রত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বয়োবৃদ্ধি, সহিংসতা, যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব, মর্যদাহানী কর পরিবেশ, দরিদ্রতমভাবে জোর করে কাজ নিয়ন্ত্রণ রাখা, যৌনতা, লিঙ্গভেদে হিংস্রতা, ক্ষতিকর ঐতিহ্যবাহী অভ্যাস এবং পরিমাপ পদ্ধতির উন্নয়ন। ৩৫ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে ২.৫ এবং ৩.৫ মিলিয়ন স্থানচ্যুত প্রতিবন্ধীতা নিয়ে বাস করছে, সেই সাথে অধিকসংখ্যক প্রতিবন্ধী সৃষ্টির কারণ হচ্ছে সম্প্রদায়গত দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর ফলে মানুষের অনুভূতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

অধিকতর উন্নতও অনুন্নত দেশে প্রতিবন্ধী পুরুষ এবং নারীদের উভয়কে আলাদা ভাবে ব্যপক গুরুত্বতায় বিবেচনা করা হয় সেখানে প্রতিবন্ধী পুরুষ এর মূল্য নির্ধারণ করা ১২% এবং প্রতিবন্ধী নারীদের ক্ষেত্রে ১৯.২% মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

এখনও সর্বব্যাপি বিস্তারিত ছবি লিঙ্গ ও প্রতিবন্ধিতার বিভক্ত করার মত কোন ডাটা সংগ্রহ এবং গবেষণার সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং প্রায়ই জনবহুল কারখানা গুলোতে গুনগতমানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায় যেমন,

দরিদ্র নারী, লিঙ্গ সম্পর্কে সাংস্কৃতি ধারণা, যৌনতা এবং প্রজননতা আইন, সহিংসতা, অপব্যবহার, এবং বিভিন্ন ধরনের শোষণ যেমন, শিশু শ্রম।

প্রতিবন্ধিতা কোন সীমাবন্ধ একটি আর্থ - সামাজিক দল বা কোন সাংস্কৃতি বা বয়সের দল নয়। প্রতিবন্ধিতার দুই কারনে হয় এবং একটি দারিদ্রতার পরিণতির সাথে ব্যক্তি এবং প্রতিবন্ধিতা, বিশেষত নারী ও প্রতিবন্ধী শিশু, বিশ্ব দারিদ্রতাই এর মাঝখানে প্রতিনিধিত্ব করছে। এই বিষয় একমত যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে দারিদ্রতা উন্নয়ন লাভ করা সম্ভব নয়।

**অর্থনৈতিক জীবনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি**

অর্থনৈতিক জীবনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অবস্থান অনেকটাই শূন্যের কোঠায়। মূলত অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা ব্যক্তিকে আরও বেশিমাত্রায় প্রতিবন্ধী করে তোলে। এ পর্যন্ত চাকরি, কর্মসংস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান উল্লেখ না করার মতোই। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এখনও পর্যন্ত তেমন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে দেখা যায় না। তাছাড়া, পিতা-মাতাসহ সমাজের মানুষ ভাবতেই পারে না যে কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি উপার্জন করে পারিবারিক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। উপযুক্ত দিকনির্দেশনা ও সুযোগের অভাবে তাই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যকই চোখে পড়ে সমাজের বিভিন্ন অনুৎপাদনশীল প্রক্রিয়ায়। ফলে তারা পরিগণিত হচ্ছে সমাজের বোঝা হিসেবে। কিন্তু উন্নয়নমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে তার সীমাবদ্ধতাটুকু মেনে নিয়ে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে সে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে, পারিবারিক ও সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। এতে প্রচলিত সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন ঘটবে।

**রাষ্ট্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি**

প্রচলিত সমাজ কাঠামোতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে যেমন, প্রতিটি স্তরে অবহেলার শিকার হতে হয়, তেমনি রাষ্ট্রীয় কাঠামোতেও তার অবস্থান মূলধারায় নেই। আমাদের সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে মৌলিক অধিকারের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। পবিত্র সংবিধানে ২৭নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "All citizens are equal before law and are entitled to equal protection of law"। সরকারি নিয়োগ লাভের সুযোগের সমতার ক্ষেত্রে ২৯ এর (১) উপধারায় বলা হয়েছে "There shall be equality of opportunity for all citizens in respect of employment or office in the service of the republic." সংবিধানে সকল নাগরিকের সমান সুযোগ ও অধিকার নিশ্চিত করা হলেও বাস্তবতা ভিন্ন! প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রীয় সুযোগ থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বঞ্চিত। প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ করা হলেও তার যথাযথ বাস্তবায়ন এখনও দেখা যায় না। রাষ্ট্রীয় জীবনে বৈষম্য আর বঞ্চনা প্রতিবন্ধী জনগণের ভাগ্যের সাথে লেপ্টেই আছে। রাজনৈতিক দলের ইশতেহারগুলোতে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য কোন সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা চোখে পড়ে না। আইনগত অধিকার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় সমস্ত অধিকার থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আজও বঞ্চিত। অথচ পৃথিবীর রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে দেখা যায় অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান রুজভেল্ট, সাহসী যোদ্ধা তৈমুর লং।

# ষষ্ঠ অধ্যায় (Chapter Six)

## প্রতিবন্ধী নারীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার

## (SRHR of the Women with Disabilities)

### প্রতিবন্ধী নারীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকার

ক্যাম্পেইন ফর পপুলার এডুকেশন (CAMPE) এবং নেদারল্যান্ডস অ্যাম্বাসি'র একটি গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্যের উপর যথাযথ গুরুত্বারোপ করা হয়না । সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় নানা কুসংস্কার, প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সেঠিক তথ্য ও জ্ঞানের অভাব নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। বিশেষত প্রতিবন্ধী নারীদের এসব সুযোগ থেকে বঞ্চিত করাসহ তাদেরকে সন্তান জন্মদান ও লালন পালনে নিরুৎসাহিত করা হয়। উপরন্তু প্রতিবন্ধী নারীদের দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনে অক্ষম, নির্ভরশীল, সন্তান লালন পালনে অসমর্থ বলে বিবেচনা করা হয়।

### প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিবার গঠনের অধিকার

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ হল একটি আন্তর্জাতিক আইন যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারসমূহ চিহ্নিত করে; পাশাপাশি সেই অধিকারসমূহ সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নে রাষ্ট্রসমূহের বাধ্যবাধকতা রয়েছে সনদটিতে। বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে দুটি প্রক্রিয়াও নির্ধারণ করে দেয় সনদটি: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত কমিটি; যা বাস্তবায়ন মনিটরিং করার জন্য গঠিত এবং রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলন, যা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলো পর্যালোচনার জন্য অনুষ্ঠিত হয়। এই সনদটি হল একাবিংশ শতাব্দির প্রথম সনদ এবং এটি আইনগত বাধ্যবাধকতা সম্পন্ন সর্বপ্রথম দলিল; যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ব্যাপকভাবে সুরক্ষা করে।

### ধারা-২৩: গৃহ ও পরিবারের অধিকার

১. শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিবাহ, পরিবার, পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব এবং আত্মীয়তা সম্পর্কিত সকল বিষয়ে, অন্যান্যের সাথে সমতার ভিত্তিতে, বৈষম্য দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। এর মাধ্যমে যেন:
(ক) বিবাহযোগ্য বয়সের সকল প্রতিবন্ধী আগ্রহী ব্যক্তির মুক্ত ও পূর্ণ সম্মতির ভিত্তিতে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও পরিবার গঠনের অধিকার স্বীকৃতি পায়;
(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাধীন ও দায়িত্বশীলভাবে সন্তান সংখ্যা ও জন্ম-বিরতি নির্ধারণ, বয়স-অনুযায়ী প্রজনন ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য ও শিক্ষা লাভের অধিকার নিশ্চিত হয়। এই অধিকার চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদ্ধতি যেন তাদের কাছে সহজলভ্য হয়। (গ) অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে শিশুসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রজনন উর্বরতা বজায় রাখা নিশ্চিত হয়।

এভাবে বিভিন্ন গবেষণা ও প্রকাশনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা বিশেষত প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার গঠন সংক্রান্ত তথ্য ও সেবা থেকে প্রতিবন্ধী নারীরা সবসময়ই অবহেলিত থাকছে।
জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদে (CRPD) প্রতিবন্ধী নারীর সার্বিক উন্নয়ন তথা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিয়ে ও নিজ পরিবার গঠনের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

### প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি নির্যাতন প্রতিরোধে পারিবারিক বা সামাজিক ভূমিকা

ধারা-১৫: নির্যাতন বা নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা বা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তি থেকে মুক্তি

ধারা-১৬: শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে মুক্তি

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আইনি সহায়তামূলক তথ্য

সরকারী আইনগত সেবাসমূহ :
আপনি কখন আইনগত সেবা পেতে পারেন

সরকারী আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় সেবাসমূহ :
সরকারী আইনগত সহায়তার জন্য যেখানে আবেদন করতে হবে বা কিভাবে করতে হবে :

**ধারা-১২: সমান আইনী স্বীকৃতি**

১. শরীক রাষ্ট্র দৃঢ়তার সাথে পুনর্ব্যক্ত করে যে, **প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সর্বত্রই ব্যক্তি হিসেবে** সমান আইনী স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

২. শরীক রাষ্ট্র স্বীকার করে যে, **প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ জীবনের সকল ক্ষেত্রে অন্যান্যদের** সমান আইনী কর্তৃত্ব ভোগ করবেন।

৩. আইনী কর্তৃত্ব প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা পেতে শরীক রাষ্ট্র **প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।**

**ধারা-১৩: সুবিচার প্রাপ্তির অধিকার**

**প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ তে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে**

আর্ন্তজাতিক আইন ও নীতিমালার প্রেক্ষাপটে:

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং জাতিসংঘের জনসংখ্যা বিষয়ক তহবিল (প্রজনন স্বাস্থ্য এবং গবেষণা বিভাগ) এর রিপোর্ট অনুসারে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও অন্যান্য সবার মত প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার গঠনের অধিকার রয়েছে; তবুও এ সংক্রান্ত তথ্য ও সেবাসমূহ প্রাপ্তিতে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়।

১৯৯৪ সালে মিশরের কায়রোতে অনুষ্ঠিত জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আর্ন্তজাতিক সম্মেলন (ICPD) এ প্রতিবন্ধী নারীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিনিয়োগ এবং নারীর ক্ষমতায়নের পূর্বশর্ত হিসাবে তাদের প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার গঠনের অধিকার তথা পরিবার পরিকল্পনা বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয় ।

ক্যাম্পেইন ফর পপুলার এডুকেশন (CAMPE) এবং নেদারল্যান্ডস অ্যাম্বাসি'র একটি গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্যের উপর যথাযথ গুরুত্বারোপ করা হয়না । সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় নানা কুসংস্কার, প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সঠিক তথ্য ও জ্ঞানের অভাব নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। বিশেষত প্রতিবন্ধী নারীদের এসব সুযোগ থেকে বঞ্চিত করাসহ তাদেরকে সন্তান জন্মদান ও লালন পালনে নিরুৎসাহিত করা হয়। উপরন্তু প্রতিবন্ধী নারীদের দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনে অক্ষম, নির্ভরশীল, সন্তান লালন-পালনে অসমর্থ বলে বিবেচনা করা হয়।

এভাবে বিভিন্ন গবেষণা ও প্রকাশনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা বিশেষত প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার গঠন সংক্রান্ত তথ্য ও সেবা থেকে প্রতিবন্ধী নারীরা সবসময়ই অবহেলিত থাকছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদে (CRPD) প্রতিবন্ধী নারীর সার্বিক উন্নয়ন তথা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিয়ে ও নিজ পরিবার গঠনের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

ধারা-৬: প্রতিবন্ধী নারী

১. শরীক রাষ্ট্র স্বীকার করে যে প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশুরা বহুমুখী বৈষম্যের শিকার এবং এই প্রেক্ষিতে তারা যাতে সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার সমান ও পূর্ণ উপভোগ করতে পারে সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২. এই সনদে উল্লিখিত সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা যেন প্রতিবন্ধী নারীরা পূর্ণ মাত্রায় চর্চা ও উপভোগ করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী নারীদের সার্বিক উন্নয়ন, অগ্রগতি ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা-২৩: গৃহ ও পরিবারের অধিকার

১. শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিবাহ, পরিবার, পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব এবং আত্মীয়তা সম্পর্কিত সকল বিষয়ে, অন্যান্যের সাথে সমতার ভিত্তিতে, বৈষম্য দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। এর মাধ্যমে যেন:

(ক) বিবাহযোগ্য বয়সের সকল প্রতিবন্ধী আগ্রহী ব্যক্তির মুক্ত ও পূর্ণ সম্মতির ভিত্তিতে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও পরিবার গঠনের অধিকার স্বীকৃতি পায়;

(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাধীন ও দায়িত্বশীলভাবে সন্তান সংখ্যা ও জন্ম-বিরতি নির্ধারণ, বয়স-অনুযায়ী প্রজনন ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য ও শিক্ষা লাভের অধিকার নিশ্চিত হয়। এই অধিকার চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদ্ধতি যেন তাদের কাছে সহজলভ্য হয়। (গ) অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে শিশুসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রজনন উর্বরতা বজায় রাখা নিশ্চিত হয়।

ধারা-২৫: স্বাস্থ্য

প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনরূপ বৈষম্য না করে শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সর্বাধিক অর্জনযোগ্যমানের স্বাস্থ্য লাভের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়।

(ক) অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে একই ধরণ, একই গুণ ও মানসম্পন্ন বিনামূল্যের বা স্বল্পব্যয়ী স্বাস্থ্য কর্মসূচি গ্রহণ ও সেবা প্রদান করবে। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং জনস্বাস্থ্য এই কর্মসূচি ও সেবায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

বাংলাদেশের আইন ও নীতিমালার প্রেক্ষাপটে: প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ২০০১ সালে প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদও স্বাক্ষর করেছে এবং সে আলোকে ২০১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ পাশ করা হয়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর ১৬ নং ধারায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সব ধরনের অধিকারের কথা বিশেষত পরিবার গঠনের কথা বলা আছে;

(ঙ) মাতা-পিতা, বৈধ বা আইনগত অভিভাবক, সন্তান বা পরিবারের সহিত সমাজে বসবাস, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও পরিবার গঠন।

বাংলাদেশ সরকারের নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১ এর ৩৯ নম্বর ধারা: প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য বিশেষায়িত কার্যক্রম-এ প্রতিবন্ধী নারীদের শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ, পুর্নবাসন, অর্ন্তভূক্তি ও উন্নয়ন এর বিষয় উল্লেখ থাকলেও বিয়ে ও পরিবার গঠন সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি।

**প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও সমঅধিকার:** বাংলাদেশের জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ এর দ্বিতীয় অধ্যায় এ লিখা আছে জনসাধারণ বিশেষ করে গ্রাম ও শহরের দরিদ্র এবং পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠির জন্য মানসম্পন্ন ও সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।

অষ্টম অধ্যায়ে আছে - অতি দরিদ্র ও অল্প আয়ের জনগোষ্ঠির মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে গ্রহণযোগ্য করা ও পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রীর সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা।

**বি: দ্র:** কিন্তু জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে কোথাও সুনির্দিষ্ট করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা প্রতিবন্ধী নারী বা প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের কথা উল্লেখ করা নেই।

# সহায়ক তথ্যপঞ্জি
## (Reference)

১. কিশোর-কিশোরিদের প্রজনন স্বাস্থ্য, বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিটি (এফপিএবি), ২০০৬
২. কিশোর-কিশোরিদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা, খুরশীদ জাহান বৃষ্টি, ২০১০
৩. কিশোর-কিশোরিদের যৌন সমস্যা, অসীম বর্ধন
৪. জেন্ডার বিশ্বকোষ (১ম ও ২য় খণ্ড), সেলিনা হোসেন এবং মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত, ২০০৬
৫. প্রতিবন্ধিতা ও উন্নয়ন তথ্যসংকলন, টার্নিং পয়েন্ট ফাউন্ডেশন, ২০১৭
৬. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩
৭. নিউরো- ডেভেলপমেন্টাল সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩
৮. জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০০৮

# যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার

**Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR)**

## তথ্যসংকলনটি সম্পর্কে

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার জীবনেরই অংশ; যা সম্পর্কে বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরিদের সচেতন করা এই তথ্যসংকলনের উদ্দেশ্য। এটি **টার্নিং পয়েন্ট ফাউন্ডেশন** আয়োজিত **'কিশোর-কিশোরি যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার'** শীর্ষক প্রশিক্ষণের-ই ফসল। **শেয়ার-নেট ইন্টারন্যাশনাল**-এর সহযোগিতায় ০৭-০৯ নভেম্বর ২০১৭ খ্রীষ্টাব্দে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ২০ জন কিশোর-কিশোরি অংশগ্রহণ করে; যাদের অধিকাংশই প্রতিবন্ধী কিশোর ও কিশোরি। সমাজের পিছিয়েপড়া অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকেও কয়েক জন অংশগ্রহণকারী। তাদেরই জীবনের অনুভূতি ও বাস্তব অভিজ্ঞতার পাশাপাশি প্রশিক্ষণে সহায়কবৃন্দের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় সম্মৃদ্ধ হয়েছে এ প্রশিক্ষণ; যার সমাবেশ ঘটেছে সহায়িকাটিতে।

তাই দেশের সকল কিশোর-কিশোরির উদ্দেশ্যে সহায়িকাটি উন্মুক্ত। **আমরা বিশ্বাস করি, বৈচিত্র্য, ন্যায্যতা ও সকলের অংশগ্রহণ, তবেই সম্ভব টেকসই উন্নয়ন।** এটি ব্যবহার করে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কিশোর-কিশোরিরা যদি সামান্যতমও উপকৃত হয়, আমাদের সকলের পরিশ্রম স্বার্থক মনে করবো। সহায়িকাটির প্রথম সংস্করণ এটি; যা ধাপে ধাপে উন্নয়নে আপনাদের মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করবো। ধন্যবাদান্তে, **টার্নিং পয়েন্ট ফাউন্ডেশন।**

## About the Handbook

The goal of this Handbook is to aware the Adolescents of Bangladesh on Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR). It is an output of the training on '**Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) of the Adolescents**' organized by **Turning Point Foundation** during 07-09 November 2017 with support from the **Share-Net International**. A total of 20 adolescents from the different parts of the country participated in the training. Most of them were girls and boys with disabilities. Some the participants were also from other marginalized groups of the society. The training was flourished with their own feelings and experiences as well as the vast experiences of the training Facilitators. All of these have been brought together in this Handbook.

Therefore, this Handbook is open for all adolescents of Bangladesh. We are **striving for Diversity, Equity & Inclusion for Sustainable Development**. If the youth groups around Bangladesh are benefited, even a little bit, utilizing this Handbook, we will think our initiative is successful. It is the first version of its kind and we welcome your valuable advices wholeheartedly to improve it gradually. Thank you, **Turning Point Foundation.**

সহায়িকাটি নিচের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে **(The Handbook is available at the following website)**

# www.turningpointbd.org

*শেয়ার-নেট ইন্টারন্যাশনাল -এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রকাশিত*

*(This publication is a part of a project financed by **Share-Net International**)*